ইস্টিশন
প্রকাশনা
Dhrubok
সাইফুল বাতেন টিটো
কিসফোঁড়া
কওমি মাদরাসার শিশুধর্ষণ উপাখ্যান

কওমি মাদরাসার শিশু ধর্ষণ উপাখ্যান

একটি গবেষণামূলক উপন্যাস

সাইফুল বাতেন টিটো

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.blog

বিষফোঁড়া

সাইফুল বাতেন টিটো

প্রথম ইবুক প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২০

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক
জংশন
জালাকান্দি, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ।
+৮৮ ০১৭ ১০৭৬ ০৩৮৭, fb.com/jongshon.com.bd

প্রচ্ছদ:
চারু পিন্টু

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুদ্রিত মূল্য: ২৫৫.০০ টাকা।

Bishfonra by **Saiful Baten Tito**

Published by JONGSHON, Jalakandi, Araihazar, Narayanganj.

ISBN: 978-984-94553-0-1

Istishon eBook
First eBook Published **October, 2020**
eBook Created by: Dhrubok

উৎসর্গ:

কওমি মাদরাসার সব নির্যাতিত শিশুকে
যাদের ভয়ংকর নির্যাতন করে খুন করা হলেও তাদের জন্য হয় না কোনো শোক প্রস্তাব, কেউ দাঁড়ায় না মানববন্ধনে, জ্বলে না কোনো মোমবাতি, নামে না কোনো মিছিল, কোনো দিন কেউ কথা বলেনা টক শোতে, পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় না কেউ...

উপন্যাসটি লেখার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে লেখকের উপলব্ধি,
'ধর্ম মানুষকে কখনোই নৈতিক ও মানবিক করতে পারে না'।

সাইফুল বাতেন টিটো

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

◆ লেখকের কথা ◆

এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত কওমি মাদরাসায় শিশু ধর্ষণের ও শারীরিক নির্যাতনের সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে লিখিত একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের পঁচাশি শতাংশ ঘটনাই একেবারে সত্যি। শুধু স্থান-কাল-পাত্রের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। যখন মাদরাসায় শিশু ধর্ষণ মহামারিতে রূপ নিচ্ছিল, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই বিষয়টি নিয়ে একটি গবেষণামূলক উপন্যাস লেখার। কাজ শুরু করলাম। যেহেতু সাধারণ মানুষের অনেকেরই এখন পত্রপত্রিকা থেকে আস্থা চলে গেছে, তাই আমি প্রতিটি সংবাদ যাচাই করার চেষ্টা করেছি। ফোন করেছি ঘটনাগুলো নিয়ে যেসব থানায় মামলা হয়েছে, সেই সব থানার ওসিদের কাছে। চেষ্টা করেছি সরাসরি ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার খুঁটিনাটি তথ্যসমুহ জানতে। বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার বেশভূষা পরিবর্তন করতে হয়েছে।

ঢাকা শহরের আশপাশের বেশ কিছু মাদরাসায় আমি গিয়েছি। বোঝার চেষ্টা করেছি সেখানকার পরিবেশ আসলে কেমন হয়। এরপর আমার মনে হলো, হয়তো ঢাকা বা ঢাকার আশপাশের কওমি মাদরাসার পরিবেশ একরকম আর গ্রামাঞ্চলে ভিন্নরকম। কিন্তু আসলে তা নয়। হয়তো অবস্থানের কারণে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু ভেতরের গল্প আসলে ঘুরেফিরে সব কওমি মাদরাসায়ই এক।

পুরো বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খুবই আশ্চর্য হলাম। বললে আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে, আসলে সারা বাংলাদেশের সব কওমি মাদরাসায় প্রতিদিন যে পরিমাণ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, আমরা তার মাত্র ০.০১ ভাগ সংবাদ পাই কিনা, তাতেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করলে বুঝতে পারবেন। বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যখন আমি সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলাম আর বাস্তবতা দেখলাম। আমি সংবাদ বিশ্লেষণ করে যা পেলাম তা হলো, যতগুলো ধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে বা পত্রিকায় সংবাদ হয়েছে, সব ঘটনার শিশুর বাবা-মা রয়েছে, অর্থাৎ তারা কেউ এতিম শিশু নয়। কিন্তু মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ভাষ্যমতে এতিম শিশুরাই বেশি ধর্ষণের শিকার হয়। অর্থাৎ আপনি এটা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, যত এতিম শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, তাদের একটি ঘটনাও আমরা জানতে পারি না বা সংবাদ হয় না। কারণ, কওমি মাদরাসা দিন দিন এ দেশে একটি বড় শক্তিতে রূপ নিয়েছে আর এটি পরিণত হয়েছে ধর্মীয়ভাবে খুবই স্পর্শকাতর বিষয়ে। সেখানে ধর্ষণ হোক বা যা হোক, তাদের বিরুদ্ধে পারতপক্ষে কেউ কথা বলতে চায় না। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বিষয় কাজ করে তা হলো হাফেজ, আলেম, ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুহতামিম -এরা কখনো কোনো অন্যায় করতে পারে না। এরা যে কেবলই আমাদের ধর্মীয় কাজে সহায়ক কিংবা বাংলা-ইংরেজি-অংক শিক্ষকের

মত ধর্মীয় শিক্ষক এবং সর্বোপরি আমাদের মতই দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ তা আমরা ভুলে গেছি।
কওমি মাদরাসার এতিম শিশুটির স্বজন বলতে থাকে তার দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা, চাচা, ফুপু, মামা, খালা-এরা। এরা কখনোই ওই শিশুর জন্য কওমি কমিউনিটির বিরুদ্ধে যেতে চায় না। যেখানে মা-বাবাই যেতে চায় না, সেখানে অন্যান্য আত্মীয়রা কেন যেতে চাইবে? অর্থাৎ পাকে-চক্রে মূল বড় অংশটা আমাদের জানাশোনা বা ধরাছোঁয়ার একেবারেই বাইরে থেকে যায়। এরপর আরো একটি বড় অংশ আছে, যারা এতিম নয় কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা লজ্জা বা ভয়ে কখনো-ই কাউকে বলে না। এই গেল দ্বিতীয় বড় ধর্ষণের শিকার শিশুরা। এরপরও যেসব ধর্ষিত শিশুরা বিষয়টি বলে, তাদের বেশিরভাগ মীমাংসা হয় মাদরাসার ভেতরেই। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের বাইরে এই বিভৎস ঘটনাসমুহ প্রকাশ হওয়ার কোন সুযোগই নেই। সে বিষয়ে ইসলাম ধর্ম বলে, 'মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানের দোষ গোপন করতে হবে, তাতে করে আল্লাহ্ও কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন'। এত সব ফিল্টার হওয়ার পর যেটা বাইরে যায় তার ৮০ শতাংশ সংবাদে স্থান পায় না। মাদরাসা কমিটির লোকজন, যে কোনো মূল্যেই হোক, সেটা সংবাদ হতে দেয় না। তাতে মাদরাসার দুর্নাম।
সংবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার আরও একটি বিষয় নজরে এসেছে, তা হলো যত সংবাদ আমরা পাই বা পেয়েছি, তার সবই হলো শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র ধর্ষণের ঘটনা। বড় ছাত্র কর্তৃক ছোট ছাত্র ধর্ষণের কোনো সংবাদ আমরা এ পর্যন্ত পাইনি বললেই চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও ভয়ংকর তথ্য হচ্ছে বড় ছাত্র কর্তৃক ছোট ছাত্র ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে, যা মাদরাসার ভেতরেই ধামাচাপা থাকে। কখনোই বাইরে যায় না।আপনারা হয়তো জানেন, কওমি মাদরাসায় পড়তে বয়স কোনো বাঁধা নয়। সেখানে যেকোনো বয়সের ছাত্রই ভর্তি হতে পারে। জীবনের নানা রকম অসুবিধা, বাধাবিপত্তি, অসফলতা, অপকর্ম শেষে একজন লোক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য ৪০ বছর বয়সে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যখন অবদমনের শিকার হয়, তখন সে হয়ে ওঠে বিকৃতমনা শিশুধর্ষকামী। ইসলাম ধর্মে হস্তমৈথুনও হারাম। কিন্তু শিক্ষক ও বয়সে বড় ছাত্রদের কাছে স্মার্টফোন থাকায় তারা নিয়মিত পর্নো দেখে আর প্রতিদিন এদের লালসার শিকার হয় হাজার হাজার শিশু। তারা নানা রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে শিশুদের ধর্ষণ করে।
কওমি মাদরাসায় শিশু ধর্ষণ হওয়ার হাজার কারণ রয়েছে। রয়েছে অনুকূল পরিবেশ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছোট-বড় সব ছাত্রকেই মাদরাসায় থাকতে হয় রাতদিন ২৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই আবাসিক। পাশাপাশি শিক্ষকদের খেদমত করা প্রতিটি ছাত্রের জন্যই বাধ্যতামূলক। একটা গণরুমে গাদাগাদি করে গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ের মতো থাকে অনেক ছাত্র। আমি এমনও দেখেছি, ১০ ফুট বাই ৬ ফুট রুমে একজন মানুষ চিত হয়ে শুতে যতটুকু জায়গা লাগে, ওই সাইজের বিছানা করে অনেক ছাত্র থাকে। প্রত্যেকের বিছানার সঙ্গে প্রত্যেকের বিছানা লাগানো থাকে। এছাড়া ধর্মীয় অবদমন তো রয়েছেই।

মোদ্দা কথা, প্রতিদিন যত শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, আমরা তার ০.০১ ভাগ সংবাদও পাই না। কিন্তু ভয়ের বিষয় হলো, সাধারণ মানুষ এইসব কিছুই জানে না। তাদের যখন বলা হয় মাদরাসায় এসব হয়, তখন তারা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে, পত্রিকার সংবাদের নিচে পত্রিকাকে আর সাংবাদিকদের নানা রকম নোংরা-অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে মন্তব্য করে। সেখানে তারা প্রায়ই লেখে, 'এইগুলা ইহুদি-নাসারার ষড়যন্ত্র'। তাদের এতটুকু ধারণা নেই ইহুদি কারা, এদের বসবাস কোথায়। সেই সুযোগটা আবার করে দেয় এ দেশের ওয়াজকারীরা। যারা আমজনতাকে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের কোনো অপরাধ বিশ্বাস করতে দেয় না। কোনো কিছু হলেই বলে, এসব ইহুদি-নাসারার ষড়যন্ত্র। আমি এসবকিছু এই উপন্যাসে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসব বিস্তারিত বলেতে গেলে এমন বই শ'পাঁচেক লিখতে হবে।
ভয়ের কথা হলো, দিন দিন বেড়েই চলেছে এই শিশু ধর্ষণের হার, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছে কওমি মাদরাসার পরিমাণ। এদের ওপর নেই কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ। আওয়ামী লীগ সরকার বিজ্ঞান ও বাস্তবতাবিমুখ এই কওমি শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর কওমি মাদরাসা বেড়ে চলেছে গাণিতিক হারে আর শিশু ধর্ষণ বেড়ে চলেছে জ্যামিতিক হারে।
এ দেশের মোট ছাত্রের এক-তৃতীয়াংশ এখন মাদরাসায় পড়ছে বা পড়েছে। যারা দিনের পর দিন ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়ে পরিণত হচ্ছে একেকজন মানসিক রোগীতে, নিজেই হয়ে উঠছে একজন ধর্ষক ও নির্যাতক, যারা কেউ আমাদের দূরের নয়, তারা এই সমাজেরই বৃহৎ একটা অংশ। এদের কেউ হয়তো আমার ভাই, কেউ ভাতিজা, কেউ আপনার সন্তান, কেউ আপনার ভাই। তারা মাদরাসা থেকে পাস করে কেউ হবে আপনার বাড়ির পাশের মসজিদের ইমাম কিংবা মাদরাসার শিক্ষক অথবা ইসলামি বক্তা। সবচেয়ে হাস্যকর ও একই সঙ্গে মর্মান্তিক বিষয় এই যে এরাই আবার বড় গলায় সমকামিতার বিরোধিতা করে, জুমার খুতবায় কিংবা ওয়াজে এই ধর্ষকশ্রেণিই আবার সমকামীদের হত্যার ফতোয়া দেয়। যে ফতোয়ার শিকার জুলহাস মান্নান ও মাহবুব তনয়।
কওমি মাদরাসায় যে শুধু শিশু ধর্ষণই একমাত্র সমস্যা, তা নয়। শিশুদের ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, শিক্ষাজীবনের শুরুতেই তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেওয়া, কর্মমুখী ও বাস্তবসম্মত ইহলৌকিক কোনো শিক্ষার ধার না ধারা–এরকম হাজারও সমস্যা রয়েছে। আমি এই গবেষণাধর্মী উপন্যাসে সেসবের দিকে তেমন আলোকপাত করিনি, গল্পে গল্পে শুধু শিশু ধর্ষণের বাস্তব রূপ তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র।
এই উপন্যাস লেখার কাজ অত সহজ ছিল না। এর জন্য যে গবেষণা করতে হয়েছে, সেই সময় আমি অন্য কোনো কাজ করতে পারিনি। মাদরাসায় মাদরাসায় ঘুরতে হয়েছে, প্রতিটি খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, করতে হয়েছে অনেক পড়াশোনা, কিনতে হয়েছে নানা বইপত্র, ঘোরাফেরা করতে হয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে, শিশু অধিকার ফোরামে, যেতে হয়েছে মনোরোগ চিকিৎসক ও আইনজীবীদের কাছে।

উপন্যাসটি আমি বসেই খসখস করে লিখে ফেলিনি। আমার লেগেছে দীর্ঘ দশ মাস। আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই জনাব রিয়াজ ওসমানীকে, যিনি এই বই লেখা ও প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বড় সমন্বয়কের কাজ করেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাসনুভা ফেরদৌসী, তরুলতা তাসনিম, ফাহরিয়া কবির, শান্তনু আদিব, আরিফুর রহমান, মাজহারুল ইসলাম, ফয়সাল গাজী, মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, তুষার প্রমুখকে। এ ছাড়া আরও আছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সহযোদ্ধা বন্ধু। এদের সহায়তা ছাড়া বইটি লেখা ও প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হতো বা অনেক বিলম্বিত হতো।
কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব মাদরাসার শিক্ষকদের প্রতি, যারা আমাকে তাদের মাদরাসায় প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে ভেতরের আসল খবর জানার সুযোগ করে দিয়েছেন নিজেদের অজান্তেই।
এটি কোনোভাবেই ইসলামবিরোধী কোনো উপন্যাস নয় এবং কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধেও নয়, বরং উপন্যাসটি ইসলাম ধর্মের বাংলাদেশে প্রচলিত এক কূপমণ্ডূকপশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরের জঞ্জাল নিয়ে, নানা অসংগতি নিয়ে, যা এখন বিষফোঁড়া হয়ে সমাজের গায়ে প্রতিনিয়ত জেগে উঠছে এবং একসময় তা ক্যানসারে পরিণত হয়ে এ দেশকে ধ্বংস করে ফেলবে বলে আমার ধারণা।
এই উপন্যাসে আমি কোথাও এর সমাধানবিষয়ক গল্পের অবতারণা করিনি। বাস্তবে এটার সমাধান আমার দ্বারা বলা বা প্রস্তাব করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, দেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষাব্যবস্থা এটি এবং এর সঙ্গে জড়িত ধর্মের মতো অতিস্পর্শকাতর একটি বিষয়। আর যদি বিষয়টিকে রোগের সঙ্গে তুলনা করি তো বলতে হবে, রোগ এত গভীরে চলে গেছে যে রীতিমতো মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা দরকার। এক দিনে চট করে সমাধান করার মতো সমস্যা নয়। তবে এতটুকু বলতে পারি যে এই মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষক দ্বারা শিশু ধর্ষণ বিষয়টি এই সমাজে দিনকে দিন ক্যানসারের মতো রূপ নিচ্ছে। এর জন্য দরকার হলে গণ-আন্দোলনে নামতে হবে। ফুলের মতো শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ আমরা চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারি না।
শতভাগ শুদ্ধ বলে কিছু হয় না। এই গবেষণামূলক উপন্যাসটিও শতভাগ শুদ্ধ কোনো কিছু নয়। আমি এখানে একটি কওমি মাদরাসার বাস্তবসম্মত সাধারণ চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। এর বাইরে যে কোনো কওমি মাদরাসা নেই, তা অবশ্য বলার সুযোগ নেই। তবে তা সংখ্যায় এতই নগণ্য যে তা উল্লেখ করার মতো নয়। সে মাদরাসাগুলোয় সমাজের অতি উচ্চশ্রেণির মানুষদের সন্তানেরা পড়ে এবং সেই মাদরাসাগুলো সাধারণত আবাসিক হয় না।
যদি কোনো বড় ধরনের ভুলভ্রান্তি থেকে থাকে, তা অবশ্যই আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেব।
সবার জন্য প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সাইফুল বাতেন টিটো

বেতের প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত পড়ার শব্দ বেড়ে যেতে থাকল। কিন্তু সেই পড়ার শব্দও ছাপিয়ে যায় রফিকুলের আর্তনাদ। মনে মনে শতবার আল্লাহ্‌কে ডাকে টগর। আবার শব্দ হয় বেতের। টগর চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারে সামনে কী হচ্ছে। রফিকুল টগরের তিনমাস আগে ভর্তি হয়েছে। তার মাথায় কিছুই ঢোকে না। যতই পড়ে, সব ভুলে যায়। আজ জিহাদি ওস্তাদ তার পড়া ধরেছে। এত দিন হয়ে গেল এখনো রফিকুল দেখে পড়তেও ভুল করে। ওস্তাদ তাকে ছয় পারা থেকে দেখে পড়তে বলেছিল। কিন্তু ওস্তাদের সামনে গিয়ে রফিকুল সবই ভুলে গেল। ওস্তাদ তার নিয়মমতো রফিকুলের মাথাটা নিজের দুই রানের চিপায় ঢুকিয়ে নেয়। হাতে তুলে নেয় স্পেশাল জোড়া বেত। তারপর বেতের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সযতনে একবার হাত বুলিয়ে নেয়। যেন আদর করছে নিজের সদ্য বিবাহিত ছোট বিবিকে। দুই পায়ের মাঝখানে ছটফট করছে নয় বছরের শিশু রফিকুল। সবাই জানে এরপর কী হবে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা জিহাদি ওস্তাদের শরীর-স্বাস্থ্য অত্যধিক ভালো। তার খানাখাদ্যও স্পেশাল। প্রায়ই তার বিভিন্ন বাড়িতে দাওয়াত থাকে। আর দাওয়াত মানেই খানাখাদ্যও স্পেশাল। আগে ওস্তাদ যে কোনো জায়গায় যেত, এখন আর যায় না। বেছে বেছে যায়। কবে কোথায় দাওয়াত, তা এখন তাকে ডায়েরি মেনটেইন করতে হয়। এসবের জন্য ওস্তাদের খাদেম আছে।

জিহাদি ওস্তাদ তার পেশিবহুল ডান হাত দিয়ে বেত তুলে মাথার ওপর থেকে নিজের পিঠ পর্যন্ত ঠেকাল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে বাড়ি দিল রফিকুলের পশ্চাতে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে রফিকুলও তার সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আবার সঙ্গেসঙ্গে বেড়ে গেল পড়ার শব্দ। আলিফ জবর আ, বা জবর বা, তা জবর তা, ছা জবর ছা...। রফিকুলের চিৎকারের শব্দ যাতে বেশি দূরে না যায়, এ জন্য জিহাদি ওস্তাদ কৌশলে রফিকুলকে আরও জোরে নিজের রান দিয়ে চেপে ধরে। কিন্তু ওস্তাদের মাইরের জোর এত বেশি যে রফিকুলের চিৎকারের শব্দ রানের চিপা দিয়েও বাইরে বেরিয়ে আসে খানিকটা। বাড়ি দিয়ে ওস্তাদ তার হাত বুলিয়ে দেয় রফিকুলের পাছায়। সে হাতের আঙুলে থাকে না কোনো স্নেহের পরশ। থাকে কেবলই কাম।

গুনে গুনে মোট দশটা বাড়ি দেয় জিহাদি ওস্তাদ। এবার টগরের পালা। টগর ভয়ংকর অপরাধীর মতো জিহাদি ওস্তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে ওর। বেড়ে গেল ছোট্ট বুকের ওঠানামা। টগর জানে না তার কপালে কী আছে। সে মনে মনে আল্লাকে ডাকতে থাকল। 'পড়।' বাজখাঁই গলায় হুকুম করল ওস্তাদ। টগর তিন পারা পড়তে শুরু করল এবং কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি ছাড়াই যতটুকু পড়তে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত পড়ে গেল। 'মাশাল্লাহ' বলে প্রশংসা করল ওস্তাদ। তারপর বলল,'একটা বাড়ি খাইতেই হইব। তাইলে সামনের দিনে পড়ায়ও ভুল হইব না।' একথা বলেই ওস্তাদ টগরের মাথাটা নিজের

দুই রানের চিপায় নিয়ে নিল। হুজুরের ঘাম আর আতরের গন্ধে বমি আসছে টগরের। ওর দুই চোখে অন্ধকার। মনে মনে আল্লাকে ডাকছে টগর। কখন যে ওস্তাদ শর্বশক্তি দিয়ে বাড়ি দেয়, সেই অপেক্ষাতেই আছে। কিন্তু ওস্তাদ বাড়ি দেওয়ার আগে হাত বুলিয়ে দিল টগরের সুডৌল নিতম্বে। সামনে থাকা শিশুরা জোরে জোরে পড়ছে। কিন্তু টগরকে অবাক করে দিয়ে খুব আস্তে একটা বাড়িদিল ওস্তাদ। তারপর আবার ডলতে লাগল টগরের নিতম্ব। কিন্তু নিজের রানের চিপা থেকে টগরের মাথাটা আর বের করল না। হঠাৎ টগরের মনে হলো টগর যেখান থেকে হাগু করে, ওস্তাদ সেখানে তার আঙুল দিলে আস্তে করে খোঁচা দিল। এরপর টগরের মাথাটা তার দুই রানের চিপা থেকে বের করে বলল, 'লেখাপড়া ভালো কইরা করিস। যা...'।

টগর যেন প্রাণ ফিরে পেল। মনে মনে ভাবছে, আল্লাহ্‌কে ডাকার ফলেই সে পড়া পেরেছে। গিয়ে বসল নিজের আসনে। এরপর ওস্তাদ ডাকল পাশে বসা আবু বক্করকে। টগর এখানে ভর্তি হওয়ার আগে কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত। সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে টগরের। স্কুলে খুব মজায় দিন কাটত ওর। কত্ত সুন্দর সুন্দর বই ছিল স্কুলে! কী সুন্দর ছবি! সবাই মিলে যখন একসঙ্গে ছড়া পড়ত, তখন খুব ভালো লাগত। স্কুলের সামনে একটা ছোট্ট মাঠ ছিল। সেখানে সবাই মিলে কত দুষ্টামি করত। ক্রিকেট খেলত, ফুটবল খেলত। যেদিন ফুটবল মিলত না, সেদিন খড় দিয়ে ফুটবল বানানো হতো। আবার যখন ক্রিকেট খেলা ভালো লাগত না, তখন ক্রিকেট বল দিয়ে সাতচাড়া খেলত। মাটিরভাঙা হাঁড়ি-কলসি-কিংবা টালির টুকরো দিয়ে বানাতে হয় সাত টুকরো চাড়া। সেই সাত টুকরো চাড়া একটা জায়গায় স্তূপ করে তার ওপর টেনিস বল ছুড়ে স্তূপ ভাঙতে হয়। সেই ভাঙা স্তূপ সাজাতে আসে আরেকটি দল। তাদের গায়ে বল ছুঁড়ে মারে অন্য দল। সে এক অপার আনন্দের খেলা। কিন্তু মাদরাসায় কোনো খেলা চলে না। হুজুরেরা বলে দিয়েছে, ওসব খেলা এখানে চলবে না। সব ধরনের খেলাধুলা হারাম। সেই পাপ করলে আল্লা যেমন দোজখের আগুনে পোড়াবে, তেমনি ইহজগতে ওস্তাদেরা তুলে নেবে পিঠের চামড়া। কিন্তু টগরের তারপরও খেলতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছাটা মাদরাসার বাউন্ডারির মধ্যে পাক খেয়ে একসময় মরে যায়। ওস্তাদরা সেদিন বলেছে তির-ধনুক চালানো, তরবারি চালানো, ঘোড়া চালানো আর মল্লযুদ্ধ ছাড়া আর যেকোনো খেলা ইসলামে হারাম। অন্য কোনো খেলার জায়গা ইসলামে নেই। যেসব খেলা দিয়ে শরীরচর্চার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা যায়, সেসব ছাড়া বাকি সব খেলা বিলকুল হারাম। এ কথার পর টগর আর খেলার কথা ভাবেনি। কিন্তু খেলতে তো ইচ্ছা করে।

টগর যখন স্কুলে পড়ত, তখন তো টগরের বাবা বেঁচে ছিল। যেদিন অনেক মানুষ একটা কাঠের বাক্সে একদলা পোড়া মাংস এনে রাখল, সেইদিনই নাকি টগর আর টগরের মায়ের কপাল পুড়েছে। তা টগর ওর মাকে প্রায়ই বলতে শুনেছে।

বেশিদিন নয়, বছরখানেক আগের কথা। অনেক দিন ধরে টগরের বাবা বাড়ি আসি আসি করেও আসছিল না। আর তা নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে ফোনে বেশ মান-অভিমান চলছিল। টগর প্রায়ই ভাবত, আজ বুঝি আব্বা আসবে হঠাৎ করে কাউকে কিছু না বলে। বাবা এলে

আনন্দের সীমা থাকে না টগরের। বাবা যে কদিন বাড়িতে থাকে, যেন উৎসব বয়ে যায় বাড়িজুড়ে। মা তখন ওকে কিছুই বলে না। ভালো-মন্দ রান্না হয়। বাবা কিছু খেলনা নিয়ে আসে, নিয়ে আসে রঙিন ছবির বই, কত কী! কিন্তু বাবা আসত অনেক দিন পরপর। টগরের বাবা ঢাকায় গাড়ি চালাত। গাড়ি মানে রিক্সা। গ্রামের লোকজন রিক্সাকেও কেন গাড়ি বলে তা টগর বুঝতে পারে না। সেই গাড়ি চালিয়ে যা যা আয় হতো, তা দিয়ে টগর, টগরের মা আর দাদির ভালোই চলত।

সেই দিনটির কথা আজও মনে আছে টগরের। স্কুল থেকে ফিরছিল ও। নেভি ব্লু হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্টের স্কুল ড্রেস-স্যান্ডেল পরে টগর স্কুলে যেত। সবাই পায়ে কেডস পরলেও টগরের বাবা টগরকে কেডস কিনে দিতে পারেনি। বলেছে, এ বছর পরীক্ষায় প্রথম হতে পারলে কিনে দেবে। তখন ওর পরীক্ষার অল্প কিছুদিন বাকি। গায়ে পায়ে একরাশ ধুলো নিয়ে ঘাসের ডগা চিবুতে চিবুতে টগর যখন জামতলি বাজার পার হয়ে বাড়ি ফিরছিল, তখন টগরের মায়ের চাচাতো ভাই বশির মামা এসে টগরকে পেছন থেকে কোলে তুলে নিল। টগর তো প্রথমে ভেবেছিল আব্বা। টগরকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বশির মামা বলেছিল, 'তোর আব্বায় একছিডিন করছে'। টগর তখন 'একছিডিন'-এর মানে পুরোপুরি না বুঝলেও এটা বুঝেছে, আব্বার সঙ্গে খারাপ কিছু হয়েছে। টগর বাড়িতে ফিরে দেখে একটা থমথমে পরিবেশ। কেউ কোনো কথা বলছে না। টগরের দাদি বুক চাপড়ে কাঁদছে আর বলছে, 'ওরে আমার সোনা জাদু রে...আমারে ছাইড়া তুই কই গেলি রে...'। টগর মাকে কোথাও দেখতে পেল না। সবাই টগরকে ঘিরে আছে। কেউ ওকে তেমন কিছু বলছে না। টগর একসময় জানতে পারল, ওর চাচা আর ওর মা বাবাকে আনতে থানায় গেছে। সেদিন টগরের সবকিছু বুঝতে বুঝতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। টগরের রিকশাচালক বাবা অবরোধে পিকেটারদের ছোড়া পেট্রলবোমায় পুড়ে মারা গেছেন। বাবার পোড়া শরীরটাকে বাক্সবন্দী করে নিয়ে এল পুলিশ, মেম্বার চাচা, চেয়ারম্যান চাচাসহ আরও অনেকে। বাড়ির উঠান ভরে গিয়েছিল লোকে। বাবা যে আর কোনোদিন ওকে কাঁধে করে ঘুরবে না, নিজহাতে গোসল করিয়ে দেবে না, জামতলি বাজারে নিয়ে রসগোল্লা আর পাউরুটি কিনে খাওয়াবে না, তা বুঝতে ছোট্ট টগরের খুব বেশি সময় লাগেনি। বাবাকে হারানোর বেদনাটা মাত্র নয় বছর বয়সেই সহ্য করে নিতে হয়েছে ওকে। আর বাবাকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে ওকে হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। এখানে ভর্তি হওয়ার মাস তিনেক আগে ডেঙ্গু নামক রোগে মা মারা যাওয়ার পর টগর হয়ে যায় পুরোপুরি এতিম। তার আশ্রয় হয় একমাত্র ফুপুর বাড়িতে। সেই ফুপুই যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে ওকে এই মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়ে।

এখানে ভর্তি হওয়ার পর টগরের প্রথম প্রথম তেমন ভালো কোনো ভালো বন্ধু ছিল না। সবার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি প্রথম প্রথম। ওর আগে যারা ভর্তি হয়েছে, তারা সবাই ওর সিনিয়র ছাত্র ভাই। চাইলেও টগর সবার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারে না। এখানকার ছাত্র ভাইরা সবাই স্কুলের মতো নয়। মানে অতটা মন খোলা নয়। মনে হয় সবাই সব সময় একটা রহস্য লুকিয়ে রাখে। সবার মধ্যে সব সময় একটা চাপা ভয় কাজ করে।

এমনটা কেন, তা টগর বুঝতে পারে না। টগর আগবাড়িয়ে দুয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু তারা অল্পস্বল্প কথা বলে এড়িয়ে গেছে সব সময়।
দশটা-সোয়া দশটার দিকে ওদের পড়া শেষ হয়। এরপর বিভিন্ন এলাকায় যায় তহবিল সংগ্রহের জন্য। বলা হয়, এই তহবিল এতিম ছাত্রদের জন্য। কিন্তু টগর দেখেছে, যারা এতিম নয়, বেতন-খোরাকি দিয়ে এখানে পড়ে, থাকে, খায়–তাদেরও তহবিল সংগ্রহের জন্য যেতে হয়। আজ টগরসহ চারজনের একটা দল বের হলো। এই তহবিল সংগ্রহ করতে যেতে টগরের কেমন একটু লজ্জা লজ্জা লাগে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বলতে হয়, 'আসসালামু আলাইকুম, আমরা অমুক কওমি মাদরাসার ছাত্র। আমাদের মাদরাসাটি বিগত বছরগুলোতে বহুত হাফেজে কোরআন ও দ্বীনের আলেম তৈরি করেছে। সামনের মাসে আলহামদুলিল্লাহ আরও এতজন পাগড়ি নেবে। আমাদের মাদরাসায় রয়েছে মোট এতজন এতিম ছাত্র, যাদের থাকা-খাওয়ার খরচ দেওয়ার মতো এই আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় কেউ নাই। আপনাদের মাসিক দান, জাকাত, ফেতরা, কোরবানির চামড়ার টাকার ওপর নির্ভর করে আল্লার রহমতে আমাদের মাদরাসা চলছে, দ্বীন ইসলামের সেবা করে চলেছে, বানিয়ে চলেছে পবিত্র কোরআনের হাফেজ। সেই মাদরাসার জন্য আজ আপনাদের দুয়ারে এসে হাত পেতেছি। আল্লাহ্‌র জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যার যা সামর্থ্য আছে, দান করেন'।
টগরের শুধু ভালো লাগে এই জন্য যে সে একটু বাইরে যেতে পারে। এছাড়া সারাক্ষণ মাদরাসার ওই চারদেয়ালের মধ্যেই কাটাতে হয় সবাইকে। বড় ছাত্র ভাইরা বাইরে যেতে পারে। ছোটদের কোথাও যাওয়া কড়া নিষেধ। কেবল শুক্রবার অভিভাবক এলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের জন্য বাড়ি যেতে পারে। টগরের জন্য তো আর কোনো অভিভাবক আসে না। টগর তার মাদরাসার একজন এতিম ছাত্র।
মাসিক তহবিল সংগ্রহের সময় যে এসব কথা বলবে, সে একটু সিনিয়র ছাত্র হয়ে থাকে। বাকিরা সব দানের ধান, চাল, সুপারি ইত্যাদি টানার জন্য। বড় ছাত্র ভাইয়ের হাতে একটা রসিদ বই থাকে। যদি কেউ বিশ টাকার ওপরে দেয়, তবে তাকে তার নাম লিখে একটা রসিদ দিয়ে সম্মান করার নিয়ম। ধান, চাল, সুপারির জন্য আলাদা বস্তা রয়েছে। গ্রামে গেলে সাধারণত ধান, চাল, সুপারি ইত্যাদি মেলে। টগরের কাছে যে বস্তাটা রয়েছে, তাতে কেউ ধান দিলে তা রাখা হয়। কবে কোথায় কোন দল যাবে, তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আবার কিছু কিছু বাড়ি আছে, যেখানে কখনোই যাওয়া যাবে না। যেমন মালাউনের বাড়ি যাওয়া যাবে না কখনোই। মালাউন মানে অভিশপ্ত মূর্তি পূজারি কাফের। তাদের কেবল ঘৃণা করতে হবে। আবার কমিটির কারও বাড়িতেও যাওয়ার দরকার নেই। তারা এমনিতেই অনেক কিছু দেয়। আজ টগরদের দলটা যাবে শুভপুর গ্রামে। টগর বড়দের বলাবলি করত শুনেছে, সেই গ্রামের লোকজন খুব ভালো, দান-দক্ষিণায় তাদের উদারহস্ত। আসলে এই গ্রামের বেশিরভাগ লোক মধ্যপ্রাচ্যে থাকে।
টগররা প্রথম যে বাড়িটায় গেল, সেই বাড়িতে তিনটি ঘর। এক ঘরের দরজাই খুলল না। ভেতর থেকে বলল, 'মাফ করো।' অন্য দুই ঘর থেকে দিল পানি খাওয়ার গ্লাসের এক গ্লাস করে চাল। দেখে বোঝাই যায়, এই চাল ভিক্ষা দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে ঠিক করে।

ভিক্ষুক কিংবা মাদরাসা থেকে এলে সেখান থেকে দেওয়া হয়। ওরা সেগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে পাশের বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল। টগর হাঁটছে আর ভাবছে,ওই ঘর থেকে মাফ করেন বলল কেন? একথা তো ভিক্ষুককে বলা হয়। ওরা কি তাহলে ভিক্ষুক? ওদের সঙ্গে ভিক্ষুকের মতো আচরণ করল কেন? শরিফ ভাই যা-ই বলুক না কেন, ওদের আসলে ভিক্ষুক হিসেবেই দেখে সবাই। এভাবে যখন কালেকশনে নামে, তখন টগরের নিজের কাছে নিজেকে ভিক্ষুক মনে হয়।

বেলা যত বাড়তে লাগল, টগরদের বস্তাগুলো তত ভারী হতে শুরু করল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই সিজনে ধানই বেশি দেয়। টগরের হাতে ধানের বস্তা। ওর বেশ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছু বলা যাবে না। ওর সঙ্গের ছেলেটির হাতে চালের বস্তা। সেখানে এখন পর্যন্ত দুই কেজিও হয়নি। অথচ ওর বস্তার ওজন সাত-আট কেজি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার দুই বাড়ি থেকে সুপারি দিয়েছে। তা-ও ঢুকেছে টগরের বস্তায়। কারণ, চালের সঙ্গে তো আর সুপারি রাখা যায় না। টগরের কাছে মনে হচ্ছে জীবনটা বের হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলতে পারছে না টগর। এসব কাজে যতই কষ্ট হবে, ততই সোয়াব। ওরা যত বেশি ঘুরতে লাগল, দানের তত রকমফের হতে লাগল। কেউ কেউ টাকাও দিল। সে টাকা আছে সিনিয়র ছাত্র ভাই শরিফের কাছে। সবার মনেই উসখুস করতে লাগল কত টাকা হয়েছে জানার জন্য। কিন্তু সেটা জানতে চাওয়ার নিয়ম নেই। ওই টাকা সারা দিন শেষে জমা হবে মাদরাসার কোষাগারে। আরও কয়েকটি বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে জোহরের আজান দিয়ে দিল। টগর আর পারছে না। ওর ধানের বস্তা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধা তো রয়েছেই। ওরা ফিরবে সন্ধ্যার পর। টগর মনে মনে জানতে চাইল তারা কোথায় কখন খাবে? কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করে ওর ধমক খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। টগর ধানের বস্তাটা নামিয়ে রেখে একটু বসল। আর আগাতে ইচ্ছা করছে না। 'এই হালারপুত রাঙ্গা মুলা, ওইহানে বইছস ক্যান? সকালে খাস নাই?' টগর অতিরিক্ত ফরসা বলে ওকে মাদরাসায় রাঙ্গা মুলা ডাকা হয়। বিষয়টি টগরের কাছে একদমই ভালো লাগে না। বাবা কত্ত আদর করে টগর নামটা রেখেছে! মা প্রায়ই বলত, 'তুই হওনের পর তোর বাপ তোর দিকে দশ মিনিট ধইরা খালি চাইয়াই আছিল। তারপর আমারে কইল, "আলেয়া, পোলা তো তোর চাইতেও সুন্দর হইছে"। তারপর কপালে চুমা দিয়া কইল, "পোলার নাম রাখলাম টগর। ভালা নাম পরে থুমু"।' সেই থেকে ওর নাম নাকি টগর। সবাই যখন ওকে রাঙ্গা মুলা ডাকে, তখন ওর খুব খারাপ লাগে। আব্বার কথা মনে পড়ে। আব্বা কত্ত সুন্দর করে টান দিয়ে ডাকত- 'ট-গ-র!'

বস্তাটা কাঁধে তুলে আবার হাঁটা শুরু করে সবার সঙ্গে। অল্প কিছুদূর হেঁটেই ওরা একটা বাড়িতে ঢুকল। হাফ বিল্ডিং, ওপরে টিন দেওয়া। দেখলে মনে হয় নতুন করা বাড়ি। বাড়িতে তেমন গাছপালা নেই। বাড়ির উঠোনে আরও কয়েকজন মানুষ টুপি পরে ঘোরাফেরা করছে গম্ভীর মুখে। ওদের উঠোনের এক কোণায় দাঁড় করিয়ে শরিফ এক বয়স্ক লোকের সঙ্গে কিছু একটা বলল নিচু স্বরে। লোকটি আঙুলের ইশারায় ঘরের দাওয়ায় বসা কাউকে দেখিয়ে দিল। শরিফ তাকেও যেন কিছু একটা বলল। এর কিছু সময় পর শরিফ ওদের

হাতের ইশারায় ডাকল। ঘরের দাওয়ায় বসা লোকটি ওদের বলল, 'তোমাগো লগে যা যা আছে, এক জায়গায় রাহো। তারপর গামছা লইয়া যাইয়া গোসল কইরা অজু কইরা মসজিদে যাও সবাই'। একটু পর শরিফ ওদের বুঝিয়ে বলল বিষয়টি। আজ এই বাড়ির মালিকের বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তার জন্য মিলাদ আছে। দুপুরে খাওন আছে। টগরসহ সবার মনে একটা আনন্দ খেলে গেল। এমন দাওয়াত টগর মাদরাসায় আসার দুয়েকদিন পর এক বাড়িতে খেয়েছিল। খানাপিনার আয়োজন থাকে বেশ ভালোই। গরুর গোশত থাকে, ভুনা ডাল, ভাত খাও যত ইচ্ছা। এমন মৃত্যুবার্ষিকীতে অনেকে এতিম খাওয়াবে বলে মানত থাকে। আর ওরা তাতে যায়, পেট পুরে খেতে পারে, এতেই ওরা বেজায় খুশি। যারা হাফেজ হয়ে গেছে, তাদের তো প্রায়ই দাওয়াত থাকে। গ্রামাঞ্চলে আজকাল হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য উঠে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিয়েছে এক আরবিয় সংস্কৃতি। নতুন ঘর ওঠালে কোরআন খতম, কেউ বিদেশ গেলে সাফিনা পড়ানো হয়, এমনকি বিয়েতেও আজকাল কোরআন খতম করার প্রচলন শুরু হয়েছে। আর এসব কোরআন খতম দিতে হলে পুরো হাফেজ হতে হয়, এমন নয়। হয়তো পাঁচজন কিংবা ছয়জন বা দশজন মিলে ত্রিশ পারা কোরআন ভাগ করে পড়ে। বিনিময়ে তাদের ভালো-মন্দ খেতে দেওয়া হয়, যাওয়ার সময় দেওয়া হয় হাদিয়া। সেই হাদিয়া আবার মাদরাসায় গিয়ে জমা দিতে হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ওস্তাদের কাছে। কিছুদিন আগে নুরানি বিভাগের খুবই ছোট্ট একটি ছাত্র বিশ টাকা জমা দেয়নি বলে তাকে মেরে, পিটিয়ে শেষে কয়েকবার আছাড় মেরেছিল হাফেজ মাওলানা মোক্তার হুজুর। সে কথা মাদরাসার সবাই জানে।

আজ অনেকদিন পর ওরা ভালো-মন্দ কিছু খাবে। মাদরাসায় প্রতিদিন একই খাবার আর ভালো লাগে না। সকালে ডাল, ভাত আর আলুভর্তা বা কলাভর্তা। দুপুরে ডাল, ভাত, সবজি। রাতে সপ্তাহে দুয়েকদিন মাছ-মাংস পাওয়া যায়। তবে যারা খোরাকির টাকা দিয়ে খায়, তাদের খাবার আলাদা হয়। আর ওস্তাদদের খাবার সব সময়ই আলাদা হয়। ওদের কপালে সে খাবার মেলে না কখনোই। অজু-গোসল করে ওরা মসজিদে গেল। মাঝারি সাইজের মসজিদে অনেক লোক হয়েছে। বোঝাই যায় জোহরের সময় এত লোক হওয়ার কারণ দাওয়াত।

নামাজ শেষে এই গ্রামের এক হাফিজিয়া মাদরাসার মুহতামিম আজিজ হুজুর কেঁদেকেটে অনেক সময় ধরে দোয়া করল মৃত আশরাফ আলীর জন্য। এই হুজুরকে টগর বাদে সবাই চেনে। শরিফ আগে ওনার মাদরাসায় পড়ত। সে ওই মাদরাসার এক ছেলের কানে কানে বলল, 'তোগো ওস্তাদের এখনো লুতি কওমের অভ্যাস আছেনি?' জবাবে ছেলেটা বলল, 'আগের চাইতে বাড়ছে।' সবাই চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল। লুতি কওম বিষয়টি টগর এর মধ্যেই জেনে ফেলেছে। এদের আবার কেউ কেউ তাহাজ্জুদ হুজুর বলেও ডাকে। মানে রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার ছলে ছাত্রদের সঙ্গে তারা লুতি কওমের কাজ করে।

হাফেজ আজিজ মৃত আশরাফ আলীর ছেলের সঙ্গেই বাড়িতে রওনা দিল। বাড়িতে আসার পর সবাই মিলে কবর জিয়ারত করল। সেখানেও হাফেজ আজিজ বেশ কান্নাকাটি করল। মনে হলো তার নিজের বাপ মরেছে। তার কান্নাকাটি দেখে মাদরাসার অনেক ছাত্রই মুখ

টিপে হাসাহাসি শুরু করল। কিন্তু বাড়ির ভেতরের মহিলারাও উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি শুরু করল। তখন কেউ একজন মোনাজাতের মধ্যেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'আস্তে'। মুহূর্তেই কান্নাকাটি থেমে গেল। ওরা চারজন বেশ তৃপ্তি করে খেলো। গরুর মাংস দুবার করে দিয়েছে। যখন দ্বিতীয়বার দেয়, তখন করিম টগরের কানের কাছে মুখ এনে বলেছে, 'আশরাফ আলীর দুই পোলা সৌদি থাহে'। এর মানে যারা খাওয়াচ্ছে, তাদের বেশ টাকাপয়সা আছে। খাওয়ার পর সবার সারাদিনের পরিশ্রান্ত শরীর ছেড়ে দিল। ইচ্ছা করছে একটু ঘুমাতে। অনেক দিন পর তৃপ্তিসহকারে পেটপুরে খেয়েছে। ভাত খাওয়া শেষে আবার ফিরনির ব্যবস্থাও ছিল। এখন আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না কারোরই। এই বাড়ির লোকেরা অনেক ভালো। ওদের ধান-চালগুলো রেখে দিয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও বেশ কিছু বাড়ি থেকে তহবিল কালেকশন করে তারপর ফিরবে। তখন এই বাড়ি থেকে আগের পাওয়া ধান-চালগুলো নিয়ে যাবে। এই সুযোগ সব সময় হয় না।

ওরা যখন মাদরাসায় ফিরেছে, তখনো মাগরিবের আজান দিতে আধা ঘণ্টা বাকি। আজ পেয়েছে বারো কেজির মতো ধান, কেজি পাঁচের মতো চাল, দুইশ সুপারি আর একশ বিশ টাকা। নামাজ শেষে টগর যেখানে থাকে, সেখানে গিয়ে যা দেখল, তাতে ওর অনেক ভয় লাগল, কষ্টও লাগল। ওর পাশের বিছানায় থাকে নাজারার সগীর আলী। সগীরের মাদরাসা একদমই ভালো লাগে না। সে শুধু চলে যেতে চায়। এ বিষয়ে টগরের সঙ্গে দু-তিনবার কথাও বলেছে। টগর দেখল সগীরের পায়ের সঙ্গে কালো শিকল বাঁধা আর শিকলের অন্য প্রান্ত ফ্লোরের সঙ্গে যে রডের হুকের মতো আছে, তার সঙ্গে বাঁধা। সেখানে একটা তালা দেওয়া। সগীর বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টগরকে দেখে যেন একটু লজ্জা পেল সগীর। সগীরের এখন বয়স দশ বছর। সে টগরের চেয়ে বছরখানেকের বড়। ওর বাবা থাকে বিদেশে। এর এক বড় বোন আর এক বড় ভাই রয়েছে। বোন কলেজে পড়ে আর ভাই স্কুলে। ওকে কেন মাদরাসায় দেওয়া হয়েছে, তার জন্য মায়ের ওপর ওর রাগের সীমা নেই। সগীর ওর মাকে ছাড়া এক রাতও ঘুমাতে পারে না। মাদরাসায় রাতে প্রায়ই মা মা বলে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এ নিয়ে সবাই সকালে হাসাহাসি করে। তখন লজ্জায় সগীরের মরে যেতে ইচ্ছা করে। সগীরের এখানে একদমই ভালো লাগে না। ভালো লাগে না এখানকার শিক্ষা। ওর মা ওকে অনেক বুঝিয়েছে মাদরাসায় গেলে অনেক সোয়াব হবে। কোরআন মুখস্থ করলে সগীর বেহেশতে যেতে পারবে, এমনকি শুধু সগীর না, ও হাফেজ হলে ওর আরও পঞ্চাশজন আত্মীয়স্বজন বেহেশতে নিতে পারবে সগীর। সগীর জানে না বেহেশত কোথায়, সেখানে কবে যেতে পারবে। তবে মা বলেছে বেহেশতে গেলে সগীর যা চায়, তা-ই পাবে। আইসক্রিম, চিপস, ওয়েফার, লজেন্স, ফল-ফ্রুট সবই আছে। এমনকি সেখানে গেলে সগীর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বউও পাবে, মা বলেছে। কিন্তু সগীর জানে না সেখানে কবে কীভাবে যাবে। তবে মা একদিন বলেছে, সেখানে যেতে হবে মরার পর। সগীরের এসব কথা খুব একটা পছন্দ হয়নি। পছন্দ না হলেও অনেকগুলো মানুষকে বেহেশতে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সোনালি সময়গুলো কাটাতে হবে, এমন ভয়ংকর একটা জায়গায়, ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার করতে হয় একেকটি

দিন। সগীর আলী এর আগে দুবার পালাতে চেষ্টা করেছে। একবার পালিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সগীরের মেজ মামা, মা আর মাদরাসার হুজুর মিলে ধরে এনেছে। একবার ধরে এনেছে বাসস্ট্যান্ড থেকে। আর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মাদরাসার মুহতামিম। তাই বিকেলে নিজ হাতে সগীরের পায়ে শিকল লাগিয়েছে। কওমি মাদরাসায় শিশুদের পায়ে শিকল লাগানো এমন কোনো বিষয় নয়। এমন শিকল অনেকের পায়েই লাগানো আছে এখানে। এমনকি গলায়ও পশুর মতো শিকল লাগিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে অনেককে।

এই মাদরাসা আজ এই এলাকার বিশাল গৌরব ও বিরাট সম্মানের বিষয়। মাদরাসার আশপাশের লোকজন নিজেকে মাদরাসার পাশের বাড়ির লোক বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে, সম্মানিত বোধ করে। এ মাদরাসা এখন এই এলাকার গর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসবই হয়েছে কমিটির সভাপতি আলহাজ নওশাদ চৌধুরী ওরফে সুদি নশু ও মুহতামিম হুজুরে কল্যাণে। নওশাদ চৌধুরী এই মাদরাসা দেওয়ার পর জনপ্রিয়তার কারণে প্রথমে হয় এলাকার মেম্বার। একটানা তিনবার মেম্বার থাকার পর সে চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়ে জিতে যায়। শুধু সর্বশেষ নির্বাচনে সে হেরেছে। তা-ও হারতো না, নিজেদের লোকেরা পেছন থেকে ছুরি মেরেছে বলেই হেরেছে।

মুহতামিম হুজুরের বাড়ি এখনে নয়। সে এই এলাকার লোকও নয়। অনেক দূরে তার বাড়ি। সে এখানে আসার এক ইতিহাসও রয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়। অনেক অনেক আগের কথা।

ইব্রাহিমের এখন তের পারা চলছে। তের পারার শেষ দিকে ওর একটু বাজে লাগছে। এমনিতে ভালো ছাত্র হিসেবে ওর সুনাম আছে। মাদরাসায় এসেছে এক বছর হয়েছে। ওর বিশ্বাস, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর মাস ছয়েকের মধ্যে ও হেফজ শেষ করতে পারবে। ইব্রাহিমও এই মাদরাসার একজন এতিম ছাত্র। ইব্রাহিমের বাবা কৃষিকাজ করত। বছর তিনেক আগে এক ঘোর মেঘলা দিনে সবার কথা অগ্রাহ্য করে মাঠে গিয়েছিল বীজ লাগাতে। বাড়ি ফিরল পোড়া লাশ হয়ে। এ নিয়ে ইব্রাহিম আর ওর মাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। 'মহের লোক ভালো হইলে কি আর তার গায়ে আল্লা ঠাডা হালায়।' 'উপর দিয়া তো ভালো লোকই মনে হইত, ভিত্রে ভিত্রে কত পাপ কইরা বেড়াইত কেডা জানে? ভালা লোকের গায়ে ঠাডা পড়ে কেউ হুনছে কোনো দিন?' এমন কথার বাণে প্রায়ই জর্জরিত হতে হতো ওকে আর ওর বিধবা মাকে। এমন কথা এখনো ইব্রাহিমকে শুনতে হয়। পরের জমিতে খেটে খাওয়া মহেরের তিন কুলে কেউ ছিল না ছেলে আর বউ ছাড়া। থাকত মেম্বারের গোয়ালঘরের পাশে ঘর বানিয়ে। মহের মারা যাওয়ার পর কারণে-অকারণে প্রায়ই মেম্বার যেত মহেরের সুন্দরী বউ আকলিমার ঘরে। নানা কথায় সরাসরি কিছু না বললেও ঠারে ঠারে অনেক কিছুই বোঝাতে চাইত। আকলিমা বুঝেও না বোঝার ভান করত। কৌশলে এড়িয়ে যেত। এক ঝড়ের রাতে কোনো কৌশলেই আর কাজ হলো না। ইব্রাহিম নানা বাড়িতে থাকায় একলা ঘরে আকলিমাকে ঠেসে ধরল জব্বার মেম্বার। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল গায়ের ব্লাউজ। হঠাৎ একটা আঙুল এসে পড়ল আকলিমার মুখে। আর যায় কোথায়? শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে কামড়ে ধরল মেম্বারের আঙুল। জান্তব চিৎকার দিয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো আকলিমাকে। আকলিমাও সুযোগ পেয়ে বেড়ার সঙ্গে গোঁজা খেজুরগাছ কাটা দা নিয়ে তেড়ে গেল মেম্বারের দিকে। ঝড়ের মধ্যে পালিয়ে গেল মেম্বার। ফজরের আজানের আগে আকলিমা

সবকিছু গুছিয়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। সেখানেও আকলিমার এক চাচাতো ভাই রাতদুপুরে আকলিমাকে জ্বালাতে শুরু করল। শেষে আকলিমার মা-বাবা মিলে সিদ্ধান্ত নিল, মেয়েকে আবার বিয়ে দেবে। সুন্দরী আকলিমার পাত্র পেতে দেরি হলো না। একা হয়ে গেল ইব্রাহিম। হয়ে গেল এতিম। ভর্তি হলো এই মাদরাসায়। প্রথম প্রথম মা মাসে একবার করে আসত। এখন আর কেউ আসে না। না মা, না ওর নানা-নানি-মামা-খালা। তারা ওকে খুব একটা পছন্দও করে না। প্রথম প্রথম ছুটি পেলে ইব্রাহিম নানাবাড়িতে যেত। নানি মারা যাওয়ার পর দেখা গেল ও যায় ঠিকই কিন্তু ওকে কেউ খেতেও ডাকে না। রাতে একবার নানু জিজ্ঞেস করেছিল ইব্রাহিম খেয়েছে কিনা। যখন বলল খায়নি, তখন নানা উল্টা ইব্রাহিমের ওপর রাগ করেছিল। 'তোরে ডাইকা ডাইকা খাওয়াইব কেডা? এই বাড়িতে তোর চাকর রাখা আছে নাকি? দেহস না আমি নিজেই খাইতে পারি না।' এরপর ইব্রাহিমের আর কখনো নানাবাড়ি যেতে ইচ্ছা করেনি। মাদরাসায় ও যে খুব ভালো আছে, এমন নয়। এখানেও ভালো লাগে না ওর। খালি মায়ের জন্য মনটা কেমন করে। কিন্তু মা তো আর ধারেকাছে থাকে না। থাকে অনেক দূরে, তার স্বামীর বাড়িতে। সেখান থেকে আসতেই একদিন লেগে যায়। মাদরাসাটাকে ওর জেলখানা মনেহয়। খালি পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যাবেই-বা কোথায়?

ইব্রাহিমের বয়স এগারো। দেখতে বেশ ফুটফুটে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর সাদা টুপিতে সদা হাস্যোজ্জ্বল ইব্রাহিমকে দেখতে সবারই ভালো লাগে। মিশুক আর পরোপকারী হিসেবে ওর পরিচিতি রয়েছে মাদরাসায়। নিজের কষ্ট নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে সবসময়। কিন্তু পড়া না পারার কষ্ট চাপিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। পড়া না পারলে যে শাস্তি ওস্তাদেরা দেয়, তা অবর্ণনীয়, অসহনীয়। গত পরশু ইব্রাহিমসহ ১২ জনকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল দুই হাতে ইট দিয়ে। তার মধ্যে চারজন পড়ে গিয়েছিল। তারপরও ছায়ায় যেতে দেয়নি। সকাল নয়টা থেকে জোহরের আজান পর্যন্ত সবাইকে প্রখর রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। যে চারজন পড়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে দুজনের জ্বর এসেছে। ওস্তাদ বলেছে ঢং করছে। কিন্তু সবাই দেখেছে প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছিল ওরা। ইব্রাহিম নিজের জন্য এমন শাস্তি চায় না কখনো। তাই ও আবু বক্কর ওস্তাদের কাছে আলাদাভাবে পড়তে যেতে চায়। ওস্তাদ অবশ্য না করেনি। দুপুরে খেয়ে যখন সবাই ঘুমায়, তখন যেতে বলেছে। এই সময় ইব্রাহিমেরও ঘুমাতে ভালো লাগে। কিন্তু ওই শাস্তির কথা মনে উঠলে চোখের ঘুম পালিয়ে যায়। সাত সাগর তের নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়েছে বেশ কিছু সময় হলো। ইব্রাহিম কোরআন মজিদ আর রেহেল নিয়ে মসজিদের তিনতলায় আবু বক্কর ওস্তাদের মিনারের ঘরে রওনা দেয়। গিয়ে দেখে ওস্তাদের ঘরের দরজা খোলাই রয়েছে। সালাম দিয়ে রুমে ঢুকল ইব্রাহিম। ওস্তাদ শুয়ে আছে। ওকে দেখে উঠে বসল। ইব্রাহিমকে বসতে বলে মাথার কাছে দড়িতে টানানো কোরা গেঞ্জিটা আর টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা নিয়ে পরে বলল, 'কই, বাইর কর'। ইব্রাহিম তের পারার শেষ দিক থেকে বের করে পড়তে শুরু করল। যেখান থেকে আটকে যাচ্ছিল, সেখান থেকে ওস্তাদ বলে দেওয়ার পর সবকিছু ওর কাছে পানির মতো সোজা হয়ে গেল। আসরের কিছু আগ পর্যন্ত ওস্তাদের

কাছে পড়ার পর ওস্তাদ বলল, ‘আমার পিঠটা কেমন ম্যাজম্যাজ করতেছে। একটু মালিশ কইরা দে তো, ইব্রাহিম’। বলেই ওস্তাদ গায়ের কোরা গেঞ্জিটা খুলে ফেলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইব্রাহিম মালিশ করা শুরু করল। ওস্তাদদের কথা না শুনলে সোজা দোজখে যেতে হবে, সে বয়ান ইব্রাহিমসহ অন্য ছাত্ররা শতসহস্রবার শুনেছে। মালিশ না করে উপায় কী? কে পুড়তে চায় ওই দোজখের আগুনে?

পায়ে শিকল দেওয়া ছাত্রদের একজন মারুফ। বয়স মাত্র আট। মারুফও থাকতে চায় না মাদরাসায়। এখানে হুজুরেরা কথায় কথায় মারে, খেলতে দেয় না, রাত তিনটার সময় ঘুম থেকে ওঠায়। মারুফ মুলার তরকারি খেতে কখনোই পছন্দ করে না, কিন্তু এখানে রোজ মুলার তরকারি রান্না করে। সবচেয়ে বড় কথা, মোক্তার ওস্তাদ মারুফের সঙ্গে অনেক পচা একটা কাজ করেছে। তাতে মারুফ অনেক ব্যথা পেয়েছে। সে সময় মারুফ অনেক চিৎকার করেছিল। কিন্তু ওস্তাদ মুখ চেপে ধরে রেখেছিল। মারুফের তখন খুব ব্যথা লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল, শ্বাস নিতে পারছিল না, লজ্জা লাগছিল। মরে যেতে ইচ্ছা করছিল ওর। মারুফ এখান থেকে একবার বের হতে পারলেই মাকে সবকিছু বলে দেবে। এখানে থাকতে কাউকে কিছু বলা যাবে না। ওস্তাদ তাহলে মেরে ফেলবে। তাই মারুফ অনেক ব্যথা পেলেও কাউকে কিছুই বলেনি। কিন্তু ও এখান থেকে কী করে পালাবে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু যে করেই হোক, একদিন না একদিন সে পালিয়ে যাবেই। পালিয়ে যাওয়ার পর আব্বুকে আর ভাইয়াকে বলবে মোক্তার ওস্তাদকে ধরতে। সে মারুফের সঙ্গে অনেক পচা কাজ করেছে, অনেক পচা কাজ। মনে উঠলেই মারুফের বমি আসে। ফজরের নামাজের পর থেকেই মাদরাসার মাঠের ঠিক মাঝখানে নয়টি শিশু একে-অপরের কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে একজন অন্যজনের কান ধরে জোরে টান দিচ্ছে। গোলাম পারভেজ আব্দুল মজিদের কানে একটু জোরে টান দিয়ে বলল, ‘বক্কর ওস্তাদ কইছে, এরপর যে বিছানা ভিজাইবে, তারে খ্যাতা ধোয়া পানি তারে খাওয়াইব’। এই কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সেই হাসি শুনে জোড়া বেত নিয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়ে এল বক্কর ওস্তাদ। এসেই সবার পাছায় চটাস চটাস বাড়ি মারা শুরু করল। অমনি সবার হাসি চিৎকারে পরিণত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে পড়ার আওয়াজ বেড়ে গেল। আলিফ জবর আ, বা জবর বা, তা জবর তা। নুরানি বিভাগে এমন নির্দেশনা দেওয়া থাকে। যদি কখনো মারের চোটে কেউ চিল্লায়, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে জোরে জোরে পড়তে হবে। মাঠের মধ্যে রোদ বাড়ছে। জোড়া বেতের বাড়ি খাওয়ার পর কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা এসেছে। কিন্তু ঘামে সাদা পাঞ্জাবি ভিজে শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে জায়গায় জায়গায়। কপাল চুয়ে ঘাম পড়ছে চোখে। সবার চোখ জ্বালা করছে। এদের অপরাধ, এরা সবাই রাতে ঘুমের ঘোরে বিছানা ভিজিয়েছে। এই সব শিশুর বয়স চার থেকে ছয়। এদের এই শাস্তি চলবে জোহরের আজানের আগ পর্যন্ত। এভাবে প্রতিদিন কোনো না কোনো দল কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মাঠের মাঝখানে। এরপর এরা যখন ক্লাসে জয়েন করে, তখন আবার এদের দেখে সবাই হাসে টিটকারি মারে।

শুক্রবার আটটার পর থেকে আর পড়াশোনা করতে হয় না। মসজিদ-মাদরাসা ধোয়া-মোছার কাজ চলে জুমার নামাজের আগ পর্যন্ত। প্রথমে কার্পেট তুলে ভালো করে তিনবার ঝাড়ু দিতে হয়। তারপর ডিটার্জেন্ট গোলা পানি দিয়ে মেঝে মুছতে হয়। মাসে একদিন করে সব সিলিং ফ্যান মুছতে হয়। দোতলা মসজিদ, তিনতলার কাজ চলছে। তিনতলার একপাশে মিনারের কাজ শেষ। সেখানে মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক থাকে। ছাত্রদের বেশিরভাগ থাকে মাদরাসার ভবনে। কিছু থাকে মসজিদের দোতলায়। এখানে পড়তে হলে প্রথম শর্ত হলো এখানে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। এখানে শুরু নুরানি থেকে। আছে নাজারা, হেফজ, হাদিসখানা, কিতাবখানা, শেষ পর্যন্ত দাওরায়ে হাদিস। ছাত্রদের মধ্যে চার বছর বয়স থেকে শুরু করে আছে চল্লিশ বছরের ছাত্র পর্যন্ত। দ্বীনি শিক্ষায় কোনো বয়স নেই।

এই যে কওমি মাদরাসা, তিনতলা মসজিদ, এত ছাত্র, এত সম্মান, এত গৌরব–এসব একদিনে গড়ে ওঠেনি। এখানকার মুহতামিম এর ভিত্তি শুরু করেছিল আজ থেকে বহু আগে কমিটির আজীবন সভাপতি সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ নওশাদ চৌধুরীর কাছারিঘরে মাত্র চারজন ছাত্র দিয়ে।

◆ ০৪ ◆

সে অনেক দিন আগের কথা। একদিন দুপুরবেলা আদালতে হাজিরা শেষে গাছের ছায়ায় চেয়ার পেতে বসেছে এলাকার বিশিষ্ট সুদের কারবারি সুদি নশু। তখন সে নওশাদ চৌধুরীও ছিল না। আর আলহাজ্বও ছিল না। ছিল সুদি নশু। চেয়ারে বসে বেলের শরবত আর কাজের ছেলে কাম ভাতিজা মোস্তাকের হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে যখন তার চোখ সবে বুজে আসছিল, তখন সুদি নশু টের পেল কেউ একজন সালাম দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কিছু একটা বলছে ওয়াজ আর ভিক্ষার সুরে। চোখ খুলে বলল, 'কী হইছে?' ভালো করে তাকিয়ে দেখে কাছারিঘরের কোণায় দাঁড়ানো ২৪-২৫ বছরের এক যুবক। চমকে গেল সুদি। তার মাথায় পাগড়ি, মুখভর্তি দাড়ি, পাঞ্জাবি হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। টকটকে ফরসা ছেলেটার চোখের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে। লম্বায় পাঁচফুট ছয় ইঞ্চির অধিক বৈ কম নয়। মেদহীন শরীর। ছেলেটি আবার সালাম দিয়ে বলা শুরু করল, 'জনাব, আমি একজন মুফতি মাওলানা। ত্রিশ পারা কোরআনের হাফেজ। জনাব, নদীভাঙনে আমার সব হারিয়েছি। আল্লার এই দুনিয়ায় আমার মাথা গোঁজার কোনো জায়গা নেই, জনাব। তাই আপনাদের দুয়ারে এসে হাত পেতেছি, জনাব'। সুদি নশু মূলত সুদের কারবার করে আর জমির দালালি করে। জমির দালালি আজ থেকে না, সেই গন্ডগোলের সময় যখন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল, তখন হাতেখড়ি। সে এখন নিজে যে বাড়িটাতে আছে, সেটাও বাবুল কৃষ্ণ হালদারের বাড়ি, তার বাবা দখল নিয়েছিল মাত্র ৭৮০ টাকা আর এক ভরি সোনার বিনিময়ে। সুদের কারবার আর জমির দালালি করে খুব অল্প দিনে সে আঙুল ফুলে কলাগাছ না, এক্কেবারে বটগাছে পরিণত হয়। এরপর যখন পাকাপাকিভাবে সুদের কারবার শুরু করে, তখন তার নাম হয়ে যায় সুদি নশু। সে গ্রামের গরিব মানুষের জমির দলিল রেখে চড়া সুদে লোন দেয়। যার জমির দলিল থাকে না, সে হালের বলদ রেখে সুদ নেয়। তবে বেশিরভাগই সেই জমি বা হালের বলদ আর ফেরত নিতে পারে না। কারণ, দিন দিন বাড়তে থাকে সুদ, যা আসলের দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সুদি নশুর সুদ সর্বদা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। ফলে সুদি নশুর জমিজমা এখন অনেক। তার বক্তব্য 'আল্লায় তারে দিছে'।

ইসলামে সুদ খাওয়া হারাম বলে সে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে সুদ খাওয়ার পাপের ক্ষমা পেতে আল্লার কাছে কান্নাকাটি করে, তওবা করে, আল্লার কাছে মাফ চায়। মুন্সি-মৌলভি, আলেম-ওলামা, এতিম খাওয়ায় নিয়মিত। দান-খয়রাত করে প্রচুর। দান-খয়রাত দেওয়ার ব্যাপারে সুদি নশু কখনো কৃপণতা করে না। আল্লাহ্ কোন অসিলায় কখন কাকে ক্ষমা করে দেয়, কে বলতে পারে? সুদ খাওয়া ছাড়া তার আর তেমন কোনো দোষ নেই। মাঝেমধ্যে একটু 'পানিপুনি' খায়। সে আর এমন কী? আর একটু 'কচি পোলার' প্রতি চাহিদা আছে। মেয়েমানুষও তার কম পছন্দ নয়। তবে পুরুষ মানুষের এই অভ্যাস কোনো দোষের মধ্যে

পড়ে বলে নশু মনে করে না। কিন্তু সমস্যা হলো সুদি নশু নিজের নামটাও লিখতে পারে না। এজন্য তার ঝানু লোক ছিল আগে। সে প্রতারণা করার পর এখন সে তার ভাইপো মোস্তাককে এ দায়িত্ব দিয়েছে। মোস্তাককে সে লেখাপড়া করায়। মোস্তাক তার আপন ভাইয়ের ছেলে। মোস্তাকের বাবা-মা বছর চারেক আগে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। এলাকায় গুজব আছে, সুদি নশু তার ভাইয়ের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। মোস্তাক নানাবাড়ি ছিল বলে বেঁচে গেছে।

ভালো করে চোখ খুলে নশু বলল, বাড়ি কই?

– শেরপুর, জনাব।

– কোথায় থাকেন?

– আল্লার ঘর মসজিদে থাকি, জনাব।

– আসেন, এদিকে আসেন’। হাতের ইশারায় মুফতি সাহেবকে কাছে ডাকল নশু।

– মোস্তাক, মাওলানা সাহেবের জন্য একটা চেয়ার আন, আর কিছু খানাপিনা আন।

– কয় ভাইবোন আপনারা?

– আমি একা, জনাব। আমার আর কেনো ভাইবোন নাই।

– বাপ-মা?

– বাবা যখন মারা গেছে, তখন আমার বয়স এক বছর। তার চেহারা ইয়াদ নাই, আর নদীভাঙনের সময় মা চলে গেছে, বলে মুফতি মাওলানা পাগড়ির খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

– আহা রে..., পড়ালেখা কোথায় করেছেন?

– আমি ওমুক কওমি মাদরাসা থেকে হেফজ করেছি, তারপর তমুক মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস শেষ করেছি, এরপর সমুক মাদরাসা থেকে...

– আলহামদুলিল্লাহ! মুখে আলহামদুলিল্লাহ বললেও নশু আসলে কিছুই বোঝেনি। শুধু এতটুকু বুঝেছে, এই ছেলে ত্রিশ পারা কোরআনের হাফেজ, আরও বড় বড় ইসলামি লাইনের ডিগ্রি তার রয়েছে।

– কী কাজ করতেন?

– একটা কওমি মাদরাসায় পড়াতাম আর একটা মসজিদে ইমামতি করতাম, আল্লার হুকুমে নদীভাঙনে মসজিদ-মাদরাসা সব গেছে, বলে মাওলানা আবার পাগড়ির খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

– আহা রে! যাক আল্লায় যা করে, ভালোর জন্যই করে। এখন কী করবেন? এইভাবে মানুষের কাছে হাত পাইতা খাইয়া আর মসজিদে ঘুমাইয়া জীবন পার হবে?

– কী করব জানি না, জনাব। তবে আমি একজন হাফেজ-এ-কোরআন। একজন মুফতি। মহান আল্লাহ্‌সুবাহনুতাআলা আমাকে না খাইয়ে রাখবে না, আমার বিশ্বাস। তিনি একটা না একটা ব্যবস্থা আমার জন্য করবেনই।

মাওলানার ইমানের জোর দেখে নশু মুগ্ধ হয়ে গেল।

আল্লা করুক আর সুদি নশু করুক, মুফতি মাওলানার একটা সুব্যবস্থা হলে গেল। সুদি নশুর বাড়িতে জায়গির হিসেবে থাকার জায়গা হলে গেল মুফতি সাহেবের। বাড়িতে যত যুবক আর শিশু রয়েছে, তাদের পবিত্র কোরআন শেখানোর দায়িত্ব আজ থেকে এই মাওলানার। মহিলারাও শিখবে, তবে পর্দার আড়ালে আর বাড়ির পুরুষের উপস্থিতিতে। মুফতির থাকার জায়গা হলো সুদি নশুর কাছারিঘরে। দুই দিন পর সুদি নশুর দুই বিবি, চার সন্তান, কাজের মেয়ে আসিয়া, আসিয়ার এক মেয়ে নতুন সিপারা নিয়ে পড়তে বসল পর্দার আড়ালে। পুরুষ-ছেলেরা পড়বে আসরের পর। মুফতি সাহেব যেন মেঘ না চাইতে ঝড়-বন্যা পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে ছাত্রের পরিমাণ বাড়তে থাকল। সুদি নশুর কাছারিঘর পরিণত হলো মক্তবে। বাড়িতে 'অনেক বড় মাওলানা' রাখার পর সুদি নশুর সুদের ব্যবসার দুর্নাম কিছুটা ম্লান হতে শুরু করল। ভালোর দিকে যেতে থাকল সমাজে তার অবস্থান। ধীরে ধীরে গ্রামের অনেক শিশু নশুর কাছারিঘরে আসা শুরু করল। এতে গ্রামের লোকজন বেশ খুশি। এই গ্রামের আশেপাশে কোনো জাননেওয়ালা 'বড় মাওলানা' ছিল না। বিষয়টি গ্রামের জন্য মঙ্গলজনকই মনে করল সবাই। মাসখানেক পর একদিন মাগরিবের সময় মুফতি সাহেব কাছারিঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দুই কানে হাত দিয়ে আজান দিয়ে দিল। তারপর বাড়ির সব পুরুষকে ডাকল নামাজে। ছেলে-বুড়ো মিলে মোট সাতজনকে নিয়ে প্রথম জামাতে নামাজ আদায় করল মুফতি সাহেব।

বিলকিসের মনটা সকাল থেকে খুব খারাপ। মনটার মধ্যে খালি খচখচ করছে। কী হয়েছে ছেলেটার? কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ আছে। এর আগে যতবার মাদরাসা থেকে বাড়ি ফিরেছে, সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখত ছেলেটা। বাড়ির সীমানায় ঢুকলেই বোঝা যেত রায়হান বাড়িতে এসেছে। একটু আগে ওর মেজ চাচি এসে জিজ্ঞেস করল, 'আজ রায়হানের বাড়িতে আসার কথা না? এহনো আহে নাই?'
– আইছে ভাবি, মনে হয় শরীলডা খুব একটা ভালো না। শুইয়া রইছে।
'ওমা, কও কী? কী হইছে?' রায়হান নওশাদ চৌধুরীর কওমি মাদরাসায় হাফেজি পড়ে। থাকা-খাওয়া সবই সেখানে। দুই ভাইয়ের মধ্যে রায়হান ছোট। বড় ছেলে হওয়ার পর দীর্ঘদিন মোজাম্মেল-বিলকিসের কোনো সন্তান হয়নি। আট বছর পর তিনতিনবার মৃত বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর মোজাম্মেল মানত করেছিল এরপর জীবিত সন্তান হলে তাকে আল্লাহ্‌র কোরআনের হাফেজ বানাবে। মোজাম্মেলের আল্লাহ্‌ মোজাম্মেলকে অবশেষে জীবিত সন্তান দিল। মোজাম্মেলও আল্লাহ্‌কে দেওয়া কথা রাখল। চার বছর বয়সে রায়হানকে হাতেখড়ি দিল মাদরাসার মুহতামিম। এরপর ছেলেকে তারা টুকটাক আলিফ বা তা ছা পড়িয়েছে। ছয় বছর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কওমি মাদরাসায় ভর্তি করা হলো আল্লাহ্‌র কোরআনের হাফেজ বানানোর জন্য। ভর্তি করানোর সময় মোজাম্মেল বলেছে, 'হুজুর, এই ছেলে এত দিন আমার ছিল। আজ থেকে সে আপনার ছাত্র, আপনারই সন্তান। তাকে একজন কোরআনের হাফেজ, দ্বীনের সেবক, সত্যিকারের সহিহ আলেম বানাতে যা যা করতে হয়, তা আপনি করবেন। ট্যাকাপয়সাসহ যা যা লাগবে, তা খালি আপনে হুকুম করবেন, আমি হাজির করব'। বিলকিস সেবার হাউমাউ করে মড়াকান্না কেঁদেছিল। মা-ছেলে কেউ কাউকে ছাড়া এক রাত ঘুমাতে পারে না। এখনো পারে না। বিলকিস সারা রাত চোখের পানি ফেলে। রায়হান সপ্তাহে একবার আসে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। তখন বিলকিসের মনে হয় আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কিন্তু আবার যখন শুক্রবার সন্ধ্যায় চলে যায়, তখন বিলকিসের বুকটা খাঁ খাঁ করে। কিন্তু এত স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করে না বিলকিস। পাছে ছেলের প্রকৃত আলেম হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তার চিন্তার মধ্যে শুধু রায়হান রায়হান আর রায়হান। যখন যেখানে যায়, সেখানে রায়হানের সঙ্গের স্মৃতি তার মনে পড়ে। ছেলেটার বয়স এ বছর আট হলো। তবু বিছানা ভেজায়। বিলকিস শুনেছে এজন্য মাদরাসায় ওকে অনেক শাস্তি দেওয়া হয়। একথা মনে উঠলেও বিলকিস কাঁদে।
রায়হানের বাবা মোজাম্মেলের টাকাপয়সার অভাব নেই। এই বয়সে যা কামিয়েছে, তা আরও সাতপুরুষ বসে বসে খেতে পারবে বলে মনে করে এলাকার লোকজন। নির্দিষ্ট কোনো পেশায় নেই সে। কী কাজ করে, তা বিলকিস ভালো করে না জানলেও অনেকে জানে। মোজাম্মেল

কখনো বিদেশে লোক পাঠায়, কখনো সিনেমায় মেয়েছেলে সাপ্লাই দেয়, কখনো সরকারি চাকরি দেয় মানুষকে, আবার কেসের দালালিও করে। এসব করেই ব্যাংকে রেখেছে কোটি কোটি টাকা। জমিজিরাত করেছে বিস্তর। ছয়-ছয়টি ইটের ভাটা রয়েছে তার। কাজকাম করতে গেলে একটু 'এদিক-সেদিক' করতে হয় বলে মোজাম্মেল মনে করে। সেটা তেমন দোষের না। সেই 'এদিক-সেদিক' কাভার্ড ভ্যান ভর্তি করে চাকরিপ্রার্থী তরুণী, অল্প বয়সী মেয়েরাও থাকে, যাদের বেশির ভাগই বিক্রি হয়ে যায় ভারতের সোনাগাছিসহ বিভিন্ন পতিতালয়ে। এসব মোজাম্মেল জেনেবুঝেই করে। শুক্রবার আর দুই ঈদের নামাজ ছাড়াও মোজাম্মেল সময়-সুযোগ পেলে নামাজ পড়ে। রোজা রাখে না। তার বদলে সারা মাস একজন জায়গির খাওয়ায়। নিজের আখেরাত নিয়ে মোজাম্মেল এখন আর খুব একটা চিন্তিত নয়। নিজের জন্ম দেওয়া ছেলেকে সে হাফেজ বানাচ্ছে। একজন হাফেজ তার পরিবারে প্রথম পঞ্চাশজনকে বিনা হিসাবে বেহেশতে নিতে পারে। একথা সে অনেকবার ওয়াজে শুনেছে। সেদিন মোবাইলের ভিডিওতে শুনেছে, আল্লামা শফী হুজুরও এই ওয়াজ করেছে। মোজাম্মেল যেহেতু রায়হানের বাবা, সেহেতু তার বেহেশতে যাওয়া আটকায় কে?

আখের গুড়ের পায়েস রায়হানের খুব পছন্দ। আজ রায়হান আসবে বলে বিলকিস বেশি করে দুধ দিয়ে পায়েস রেঁধেছে। যেই ছেলে পায়েস খাওয়া শুরু করলে বিলকিস পায়েসের পাতিল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই রায়হান আজ দুই চামচ খেয়ে বলেছে আর খাবে না, ভালো লাগছে না। কেন এমন করছে ছেলেটা? কী হয়েছে ওর? অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে সেই আসার পর থেকে। কিন্তু রায়হান কিছুই বলছে না। দুপুরের রান্না শেষে গোসল করাতে নিয়ে গেল বিলকিস। আগে রায়হান পুকুরপাড়ে গিয়েই কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটা হয়ে যেত। মাদরাসায় যাওয়ার পর আর তা করে না। বিলকিস মুখ টিপে হাসে। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বলে বিলকিস পানি গরম করল। মনের খচখচানিটা আর দূর হচ্ছে না। কী চঞ্চল ছেলেটা এমন হলো কেন? হুজুরেরা মেরেছে? হুজুরেরা যে মারবে, তা তো জানেই বিলকিস। আল্লাহ্‌র পবিত্র কোরআন মুখস্থ করতে গেলে একটু-আধটু কষ্ট করতেই হয়। এই সময়ে যে মার খায়, তা আসলে মার না, দোয়া। একথা রায়হানকে অনেকবার বুঝিয়ে বলেছে বিলকিস। বলেছে, 'শোন বাবা, কোরআন শিখার জন্য, হাফেজ হওয়ার জন্য, আলেম হওয়ার জন্য ওস্তাদের মাইর আসলে কোনো মাইর না। এইডা দোয়া। হুজুর যে সমস্ত জায়গায় মারবে, সেই সকল জায়গার জন্য দোজখের আগুন হারাম হয়ে যাবে। দোজখের আগুনে ওই সকল জায়গা পুড়বে না। দোজখের আগুনসহ অন্যান্য ভয়াবহ আজাবের কথা শুনে শিশু রায়হানও ওস্তাদদের মার মেনে নিয়েছে। সে শুধু জানে তাকে হাফেজ হতে হবে, আলেম হতে হবে। যার দিলে আল্লার কালাম থাকে, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম হয়ে যায়, তার জন্য রয়েছে বেহেশত। গোসল করানোর সময় বিলকিস আবার জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা, কারও সঙ্গে মারামারি করছ?'

– না।

– তাইলে ঝগড়া হইছে?

– না।

রায়হানের সঙ্গে যে কী হয়েছে, তা কেবল রায়হানই জানে আর জানে সোহেল ওস্তাদ। রায়হান সে কথা এই পৃথিবীর কাউকেই বলতে পারবে না। বলবেও না। কীভাবে বলবে? ওর খুব লজ্জা করে, ভয়ও করে। ওস্তাদ বলেছে, রায়হান যদি একথা কাউকে বলে তো সে টের পেয়ে যাবে, আর চাকু চালান দেবে। আর সে চাকু চালান দিলে রায়হান যেখানেই থাকুন, সোজা গিয়ে ঢুকে যাবে রায়হানের বুকে। না, রায়হান এ কথা কাউকেই বলবে না। কাউকে না।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরের কথা। সোহেল ওস্তাদ ওকে রুমে ডেকে নিয়ে গেল। এ রকম প্রায়ই ডাকত ছোটখাটো খেদমতের জন্য। কখনো রুম ঝাড়ু দেওয়া, পাজামা-পাঞ্জাবি ধোয়া, জুতা মুছে দেওয়া বা কালি করা। এসব কাজের জন্য অন্যদের মতো রায়হানেরও ডাক পড়ে মাঝেমধ্যে। সোহেল ওস্তাদ খুব রাগী। সবাই তাকে আড়ালে আবডালে জ্বর ওস্তাদ ডাকে। সে যাকে একবার কায়দামতো মারে, তার জ্বর এসে যায়। সহসা কেউ জ্বর ওস্তাদের মার খেতে চায় না। তার চোখের চাহনিতে অনেকে প্রস্রাব করে দিয়েছে, এমন রেকর্ডও আছে। তাকে সালাম দিয়ে রুমে ঢুকল রায়হান। ওস্তাদ চেয়ারে বসে মোবাইলে কিছু একটা দেখছিল আর দুই পায়ের মাঝখানে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। রায়হান আসার পর ফ্যানটা অফ করে দিয়ে বলল,"রুমটা একটু ঝাড়ু দে, রায়হান।" রায়হান ওস্তাদের খাটের তলা থেকে ঝাড়ু বের করে রুম ঝাড়ু দেওয়া শুরু করল। ওস্তাদ এক পাশে সরে দাঁড়াল। ঝাড়ু দেওয়া শেষে ওস্তাদ বলল, 'পাঞ্জাবিটা খুলে ঝাড়া দে'। রায়হান তা-ই করল। এরপর ওস্তাদ বলল, 'বাথরুমে যা, সাবান দিয়ে সুন্দর করে গোসল কর। রাইতের বেলা ধুলা-ময়লা নিয়ে ঘুমানো যাবে না। পাপ হবে। নাপাক শরীর নিয়া ঘুমানো ঠিক না। তাতে রহমতের ফেরেশতা আসে না, আসে শয়তান'। রায়হান ওস্তাদের কোনো কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে চায় না। ওস্তাদ নিজেই নিজের গামছা রায়হানকে এগিয়ে দেয়। গোসল সেরে বের হয়ে দেখে ওস্তাদ খালি গায়ে শুয়ে আছে। টেবিলে একটা বাটিতে সরিসার তেল। রায়হান চেয়ারে রাখা পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপাতে যাবে, এমন সময় ওস্তাদ বলল– 'কী, শীত লাগে?'

– না, ওস্তাদ।

– তাইলে পাঞ্জাবি গায়ে দিস না। আমার গায়ে একটু তেল মালিশ করে দে।

এইসব কাজ করতে রায়হানের একদমই ভালো লাগে না। আরেকজনের শরীর ডলাডলি কচলাকচলি করতে কেমন ঘিনঘিন করে। কিন্তু তারপরও করতে হবে। প্রথমত ওস্তাদের সেবা করলে বেহেশতের পথ সুগম হবে। দ্বিতীয়ত ওস্তাদের কথা না শোনা পাপ। কপালে জুটবে কঠিন দোজখের আগুন। সবচেয়ে বড় কথা, ইহকালের ওস্তাদের মাইর তো রয়েছেই। রায়হান প্রচণ্ড অনাগ্রহ নিয়ে তেলের বাটি হাতে নিয়ে খাটে উঠে গেল। ওস্তাদ উপুড় হয়ে শুয়ে বলল, 'শুরু কর'। রায়হান তেল হাতে নিয়ে ওস্তাদের পিঠে মালিশ করা শুরু করল। 'খালি তেল মালিশ করিস না, একটু চাপটাপও দিস।' রায়হান চাপে, ডলে আর সোহেল ওস্তাদ আরামে উহ্-আহ্ করতে থাকে। 'শুধু পিঠ ডলাডলি করলে হইব? ঠ্যাং-রান এসবও একটু মালিশ কর।' বলে ওস্তাদ তার পরনের লুঙ্গি তুলে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত নিয়ে এল। রায়হান অবাক হলো। হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলা গুনাহ। একথা অনেকবার অনেক ওস্তাদ

বলেছে। রায়হান দ্বিধায় পড়ে গেছে, বুঝতে পেরে ওস্তাদ বলল, 'চিকিৎসার জন্য কাপড় হাঁটুর উপরে উঠলে সমস্যা নেই। তাতে পাপ হয় না। সুস্থভাবে বাঁচা ফরজ। তুই অহন তেল মালিশ কইরা আমার চিকিৎসা করতেছিস। এহন হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে সমস্যা নাই। তাতে গুনাহ হয় না। দরকার হইলে শইলের সব কাপড় খুইলা ফালান যাইব। কোনো পাপ নাই তাতে। চিকিৎসার জন্য অনেক কিছু করন যায়'। এবার রায়হান ওস্তাদের ঊরুতে-পায়েও তেল মাখানোর সুযোগ পেল। বেশ কিছু সময় পর ওস্তাদ বলল, 'কাল অজু করতে যাইয়া পইড়া গেছিলাম। এই জায়গায় খুব ব্যথা পাইছি'। বলে সে তার নিতম্ব দেখাল। তারপর আবার বলল, 'এইহানে একটু তেল মালিশ করতে পারলে ভালো হইত। তাতে কিন্তু আমার উলঙ্গ হইতে হইব'। এ কথা শুনে রায়হান খুবই লজ্জা পেল। বলে কী সোহেল ওস্তাদ? উলঙ্গ হবে সে? কেমন দেখাবে অত্তবড় মানুষটাকে? এরপর ওস্তাদ বলল, 'এই ঘরে যা হইব, তা বাইরে কারও কাছে কবি না তো?'
'না ওস্তাদ।'
'ব্যথার যন্ত্রণায় আমি রাইতে ঘুমাইতে পারি না। নামাজে সিজদা দিতে পারি না, রুকু করতে পারি না এই ব্যথার জ্বালায়। এইখানে মালিশ করতে হবে।' বলে ওস্তাদ আবার তার নিতম্ব দেখাল।
'কিন্তু উলঙ্গ হইয়া তোর সামনে হুইলে কাউরে কবি না তো আবার?'
রায়হান কী বলবে বুঝতে পারল না। তারপরও যেহেতু ওস্তাদ।
'জি না ওস্তাদ, কমু না।' এমন উত্তর আশা করে, রায়হান তা-ই বলল।
'দেখ রায়হান, আমি অসুস্থ, আল্লার এবাদত করতে পারতেছি না।' রায়হান এবারও বুঝতে পারল না সে কী বলবে। ওস্তাদই বলল, 'তুই বলবি না একথা খালি মুখে বললে তো হবে না, আমি পোলাপাইন বিশ্বাস করি না। পবিত্র কোরআন শরিফ ছুঁয়ে বলতে হবে'। বলে সোহেল ওস্তাদ ওরফে জ্বর ওস্তাদ নিজে গিয়ে টেবিল থেকে কোরআন শরিফ এনে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে তাতে চুমু খেয়ে রায়হানের হাতে দিল। রায়হান ভয়ে-উত্তেজনায় কাঁপছে। ওস্তাদ বলল, 'আমি যা যা বলি, আমার লগে লগে ক, "ইয়া আল্লাহ্! তোমার বাণী পাক কোরআন সাক্ষী রেখে বলছি, এই ঘরে যা যা হইছে বা হইবে, তা আমি বাইরে কাউরে বলব না। আর ওস্তাদের চিকিৎসার জন্য ওস্তাদ যা যা করতে বলবে, সব খুশিমনে করব। যদি একথা বাইরে কাউরে বলি, তাহলে যেন আমি ইহকাল-পরকাল দুই জায়গায় কঠিন শাস্তি পাই"।' নিরুপায় রায়হান কোনো কিছু না বুঝে ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গে বলে গেল। বলার পর রায়হানের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এরপর ওস্তাদ কোরআন শরিফ টেবিলের ওপর রেখে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। 'এবার আয়, ভালো করে তেল মাখা।' বলে নিজের লুঙ্গি খুলে ফেলল। রায়হানের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল, খারাপ লাগছিল। ওস্তাদ একটু ধমকের সুরে বলল, 'কী হইল?' রায়হান সোহেল ওস্তাদের উদাম নিতম্বে সরিসার তেল দিয়ে ছানাছানি-কচলাকচলি শুরু করল। বেশ কিছু সময় পর ওস্তাদ চিত হয়ে গেল। অমনি ওস্তাদের উত্থিত লিঙ্গ দেখে ভীষণ চমকে গেল। এত বড় কারও নুনু হয়, তা সে কল্পনাও করতে পারে না। হাঁ করে দেখছে ও। ওস্তাদ বলল, 'কী দেখস?' রায়হান কোনো কথা বলল না। ওস্তাদ বলল,

‘ধরবি?’ জবাবে রায়হান বলল, ‘না ওস্তাদ, আমি যাই’। তখন হাফেজ সোহেল রায়হানের হাত ধরে কাছে টেনে বলল, ‘যাবি তো এইডা একটু মালিশ করে দিয়ে যা’। বলে হাফেজ মাওলানা সোহেল তার ছেলের চেয়ে দুই বছরের ছোট রায়হানের ইলাস্টিক দেওয়া পাজামা এক টানে খুলে ফেলল।

তারপর?

তারপর যা হয়েছে, তা রায়হান আর কখনো মনে করতে চায় না। কী লজ্জা আর ব্যথা পেয়েছিল, তা কেবল রায়হানই জানে। রায়হানের কেবল মনে হচ্ছিল,এখনই বুঝি ও মরে যাবে। চিৎকার করতে গিয়েও চিৎকার করতে পারছিল না। ওস্তাদ মুখ চেপে ধরছিল সর্বশক্তি দিয়ে। গোঁ গোঁ করছিল রায়হান। তখন ওর মনে হলো, ও বুঝি এখনই মরে যাবে। তাই মনে মনে কলেমা পড়তে শুরু করল আর বারবার আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইছিল। কিন্তু রায়হান যে যন্ত্রণার কথা মনে করতে না চাইলেও উঠতে-বসতে, টয়লেটে যেতে যখন তীব্র ব্যথা অনুভব করে, তখনই ওই বীভৎস নোংরা সময়টার কথা মনে পড়ে। কিন্তু ও কথা কাউকে বলবে কী করে রায়হান? ওস্তাদ যে পবিত্র কোরআন শরিফ ছুঁইয়ে শপথ করিয়েছে, রুমের মধ্যে যা হয়েছে, তা কাউকে বললে ইহকাল-পরকালে চরম শাস্তিপাবে রায়হান।

রাতে যখন রায়হানকে নিয়ে বিলকিস ঘুমাতে গেল, তখন বুকের মধ্যে নিয়ে রায়হানকে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে আব্বু, আমাকে বল। কেউ মেরেছে?’

– না।

– কারো লগে ঝগড়া হইছে?

– না।

– হুজুর মারছে?

এ প্রশ্নের জবাবে রায়হান একটু চুপ থেকে বলল– ‘মা, আমি আর ওই মাদরাসায় পড়ব না’। এরপর হাজারটা প্রশ্ন করেও আর কোনো উত্তর পাওয়া গেল না রায়হানের কাছ থেকে। পরদিন বাবার মোটরসাইকেলের পেছনে চড়ে কাঁদতে কাঁদতে রায়হান ফেরত গেল মাদরাসায়। থেকে গেল অনেক না বলা যন্ত্রণার কথা, যা হয়তো কোনোদিনও বলা হবে না।

হাফেজ মাওলানা কবীর আহমেদ আসরের আজানের কিছু আগে মোবাইলে একটা ভিডিও দেখছিল। এমন সময় হেফজখানার ছাত্র রেজোয়ান এসে জানাল, এমদাদুল বালির মাঠে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে। সঙ্গে সঙ্গে কবীর মাওলানার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। চট করে বিছানা ছেড়ে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে ফোন করল হাফেজ মাওলানা সোহেলকে। বলল, 'আপনের পাখি তো বালির মাঠে ক্রিকেট খেলছে। জলদি আহেন'। এরপর দুজনেই পাঞ্জাবি-টুপি পরে বের হলো। অনেক দিন ধরে দুজনের ইচ্ছা দুজন মিলে এমদাদুলকে মনের ঝাল মিটিয়ে সাইজ করবে। কিন্তু পড়ালেখায় ভালো এমদাদুলকে বাগে পাচ্ছিল না। আজ পেয়েছে। ক্রিকেট খেলা চরম গুনাহের কাজ। এই মাদরাসার কোনো ছাত্র ক্রিকেট খেলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কাউকে যদি খেলতে দেখা যায় বা কেউ যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে তো ওই দিন ওস্তাদের মাইরে তাদের বিছানায় যেতে হয়। ক্রিকেট খেলা এমনিতেই একটি ইহুদি-নাসারার খেলা। এসব ছাড়াও মাওলানা কবীর আর মাওলানা সোহেলের একটা বিশেষ ক্ষোভ আছে এই এমদাদুলের ওপর। এমদাদুলের হেফজ প্রায় শেষ। নাদুসনুদুস এমদাদুলের প্রিয় খেলা ক্রিকেট। সে এক সময় স্বপ্ন দেখত সাকিব আল হাসানের মতো বড় ক্রিকেটার হবে। কিন্তু মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর সে স্বপ্ন চুপসে গেছে। বাংলাদেশের পর প্রিয় দল পাকিস্তান হলেও তার প্রিয় খেলোয়াড় বিশ্ব বিখ্যাত অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আর মাশরাফি বিন মুর্তজা। তার প্রিয় দল পাকিস্তান। পাকিস্তান মুসলিম দেশ। প্রায় সব খেলোয়াড়ই নামাজ-রোজা করে, তা সে অনেক খেলায়ই দেখেছে।

এই মাদরাসা লুতি কওমে বিখ্যাত। সে কথা এই মাদরাসার সব ছাত্র তো জানেই, সেই সঙ্গে আশপাশে যত মাদরাসা আছে, তারাও জানে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, মাহফিলে, দাওয়াতে দেখা হলে অন্য মাদরাসার ছাত্ররা টিটকারি মারে, ইশারা-ইঙ্গিতে নানা কথা বলে। শুধু শিক্ষকেরাই যে লুতি কওম, তা নয়। সিনিয়র ছাত্ররাও সব লুতি কওম। এমনকি মাদরাসার বাবুর্চিও বেশ কয়েকবার টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘরে, স্টোররুমে ধরা পড়েছে। অন্যান্য মাদরাসায়ও প্রচুর লুতি কওম, কিন্তু ওদের মাদরাসার সঙ্গে তারা কেউ পেরে ওঠে না। সিনিয়র ছাত্ররা তো প্রায়ই ছোট ছাত্রদের মশারির মধ্যে ধরা পড়ে। তা নিয়ে বিচারও বসে। কিন্তু সেসব কথা বাইরে যায় না। ওস্তাদদের কড়া নির্দেশনা আছে। তাছাড়া কোরআন-হাদিসে আছে, মুসলমান হইয়া অন্য মুসলমানের দোষ গোপন করতে হবে। তাহলে রোজ হাশরের দিনে আল্লাহ্ও তার দোষ গোপন রাখবে।

একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল এই মাওলানা কবীর। তার খুব ইচ্ছা ছিল নুরানি বিভাগের ছাত্র তরিকুল ইসলামকে একদিন...

এক দুপুরের দিকে হিসাব-নিকাশ করে সবকিছু ব্যবস্থাও করেছিল হাফেজ কবীর। কিন্তু চূড়ান্ত সময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেলে এই এমদাদুল। প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে

গিয়েছিল হাফেজ মাওলানা কবীর আহমেদ। তরিকুল বের হয়ে সবাইকে বলেছে, সে ওস্তাদের ঘরে গিয়েছিল তার ঘর পরিষ্কার করতে। কিন্তু সবাই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। তা ছাড়া কবীর মাওলানা আগেও ধরা খেয়েছে। নতুন ব্যখ্যায় লাভ নেই। ওই ঘটনার পর থেকে কবীর মাওলানা ধান্দায় আছে কবে এমদাদুলকে কায়দামতো পাওয়া যায়। কিন্তু তাকে বাগে পাওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। আজ তাকে কায়দামতো পাওয়া গেছে। মাদরাসা থেকে বালির মাঠ বেশ দূরে। দুজন হেঁটে গিয়ে দেখল মহা আনন্দে ব্যাটিং করছে এমদাদুল। পিচ মাঠের মাঝখানে। দুজন পরিকল্পনা করে মাঠের দুই দিক দিয়ে নেমে গেল। দুই ওস্তাদ যখন এমদাদুলের কাছাকাছি চলে গেল, তখন একটি ছেলে বলে উঠল, 'এমদাদুল, তোগো হুজুর আইছে তোরে ধরতে'। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দৌড় লাগাল এমদাদুল। পেছনে ছুটলো হাফেজ মাওলানা কবীর ও হাফেজ মাওলানা সোহেল রানা। এমদাদুল বুঝতে পারল, আজ তারা ওকে ধরতে পারলে হয়তো মেরেই ফেলবে। একপ্রকার জীবন বাজি রেখে ছুটল এমদাদুল। মাঠ পেরিয়ে সোজা রাস্তায় না গিয়ে ছুটল বাগান ধরে। পেছনে ছুটল দুই হাফেজ মাওলানা। কিছু দূর যেতেই একটা কাটা গাছের গোড়ায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল এমদাদুল। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেল। চোখের সামনে লাল-নীল ছোট ছোট জোনাকি পোকার মতো কিছু একটা উড়তে দেখলো। সঙ্গেসঙ্গে ওকে ধরে ফেলল কবীর হুজুর। এক পাশ দিয়ে ধরল সোহেল হুজুরও। ধরার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে জোরে চড়-ঘুষি যে যা পারল, মারতে থাকল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল এমদাদুল। সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল সোহেল হুজুর। 'ক্রিকেট খেলাও, কুত্তার বাচ্চা? আইজ তোর ক্রিকেট খেলা পুটকির ভেতর দিয়া হান্দামু।' এমদাদুলের চোখে প্রচণ্ড আতঙ্ক। বিস্ময় আর ভয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কবীর হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হুজুর, আপনের পাও ধরতাছি, আমারে আল্লারস্তে মাফ কইরা দেন'। এ কথা শুনে কবীর মাওলানার রাগ যেন আরও বেড়ে গেল। ফের মুখের ওপর চড় বসিয়ে দিল সে। মুখ ঘোরাতে গিয়ে চরটা লাগল এমদাদুলের নাকে। সঙ্গে সঙ্গে নাক ফেটে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। দুজন মিলে ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল একটা ঝোপের আড়ালে। তারপর একটা শক্তপোক্ত দেখে লাঠি ভেঙে নিল কবীর মাওলানা। সোহেল এমদাদুলের মাথাটা আটকে ফেলল তার দুই পায়ের মাঝখানে। তারপর কবীর শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে পেটাতে শুরু করল। এমদাদুল বাবা গো-মা গো বলে চিৎকার করতে থাকল। কিন্তু তাতে মন গলল না কারোরই। কিন্তু লাঠি গেল ভেঙে। দুজনেই শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর হাত দিয়ে এগারো বছরের শিশুটিকে চোখে-মুখে-বুকে-পিঠে সজোরে ঘুষি মারতে থাকল। মার খেয়ে একসময় বেহুঁশ হয়ে গেল এমদাদুল। তারপর দুজন মিলে ওকে তুলে নিয়ে এসে মাদরাসার স্টোররুমে আটকে রাখল।

মাদরাসায় ফিরে রাশেদুল ভিডিওটা একবার চালিয়ে দেখল। তিন মিনিটের কিছু বেশি। এমদাদুলকে যখন মারছিল, তখন সেখান থেকে কিছু অংশ অত্যন্ত গোপনে ভিডিও করতে পেরেছিল রাশেদুল। রাশেদুলের হেফজ শেষ হয়েছে অনেক আগে। সে এখন হাদিসখানার সিনিয়র ছাত্র। যদিও তার ফোন রাখার অনুমতি নেই। লুকিয়ে একটা ফোন চালায় সে। সে

একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ভিডিওটা করেছে। যখন এমদাদুলকে পশুর মতো মারছিল, তখন রাশেদুলের মনে পড়ে গিয়েছিল তার হেফজ জীবনের কথা। তখনো হেফজ শেষ হয়নি ওর। এই সোহেল মাওলানা একদিন দুপুরে ওকে ডেকেছিল তার রুমে। দুটি পাজামা, দুটি পাঞ্জাবি, একটি টুপি আর একখান কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে বলেছিল রাশেদুলকে ধুয়ে দিতে। রাশেদুল যখন বাথরুমে ঢুকে কাপড়গুলোয় সাবান ঘষে নিচ্ছিল, তখন বাথরুমের দরজা ঠেলে ঢোকে সোহেল মাওলানা। ঢুকে বলল, 'রাশেদুল, একটু সরে বস, আমি গোসল করব। আর চাইলে তুইও গোসল কইরা ফালাইতে পারস।" বলেই সে বালতি থেকে পানি নিয়ে গায়ে ঢালা শুরু করল। আর তাতে রাশেদুলের গায়ে পানি গেল। গায়ে সাবান মাখানোর সময়ও রাশেদুলের গায়ে সাবানের ফেনা লাগল। তখনো 'তুইও গোসল করে ফেল' বলে সোহেল মাওলানা রাশেদুলের গায়ে এক মগ পানি ঢেলে দিল। এরপর হঠাৎ রাশেদুলকে চেপে ধরে চুমা দিতে শুরু করল হাফেজ সোহেল মাওলানা। হঠাৎ হুজুরের এমন আচরণে থতমত খেয়ে গেল রাশেদুল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করের ব্যর্থ হলো তের বছরের কিশোর রাশেদুল। সেই প্রথমবার রাশেদুলকে ধর্ষণ করল হাফেজ মাওলানা সোহেল। রাশেদুল গোসলখানা থেকে বের হয়ে একা একা কেঁদেছিল শুধু। কাউকে কিছুই বলতে পারেনি কোনোদিন। কী বলবে? কীভাবে বলবে এমন লজ্জার কথা!

এখন সে হাদিসখানায় পড়ছে। ইচ্ছা আছে একজন ইসলামি বক্তা হবে। রাশেদুলের একটা স্মার্টফোন আছে। কম দামি হলেও মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারে। রুম থেকে বাথরুমে গিয়ে সে তার 'সোনালী স্বপ্ন' নামের ফেসবুক আইডি থেকে ওই ভয়াবহ নির্যাতনের ভিডিওটা আপলোড করে দিল। তারপর মোবাইল থেকে ভিডিওটা ডিলিট করে দিয়ে শান্তভাবে আসরের সালাত আদায় করতে চলে গেল। প্রতিদিন এমন অসংখ্য দৃশ্য দেখতে হয় রাশেদুলকে। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। আজ আর সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায়নি। রাশেদুল জানে, এই ভিডিও ভাইরাল হবে। আর ভাইরাল হলে মানুষ এই দুই হারামজাদার বিচার চাইবে। এই সমস্ত জানোয়ারের বিচার হোক, সেটা রাশেদুল মনেপ্রাণে চায়। ও চায় না এমন আর কারও সঙ্গে হোক।

মাদরাসার একটি বড় আয়ের উৎস বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। এই ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে নানাভাবে আয় হয়। বাজারে বাজারে কালেকশন, রাস্তায় হ্যান্ডমাইক দিয়ে কালেকশন, গ্রামে গ্রামে কালেকশন, বড় বড় ব্যবসায়ীদের বড় দান, মানুষের মানত -এমন নানা খাত রয়েছে আয়ের। এ বছরের মাহফিল উপলক্ষে মিটিং বসেছে মাদরাসার সভাপতি নওশাদ চৌধুরীর খাসকামরায়। মিটিংয়ের বিষয় এবার ওয়াজে কাকে প্রধান বক্তা করে আনলে আয়-বাণিজ্য ভালো হবে। মুহতামিম বলল, 'মার্কেটে এখন হেলিকেপ্টার হুজুরের খুব চল, তারে আনতে পারলে কিন্তু লালে লাল'। মুহতামিমের কোনো কথায় আজকাল নওশাদ চৌধুরী তেমন দাম দেয় না। কিন্তু এই কথাটা তার মনে ধরল। তারপরও একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'বড় বড় কথা তো কও, তারে আনতে পারবা? তার রেট জানো?' তার রেট বেশি, এটা সবাই জানে। তার বর্তমান রেট দুই লাখ। বায়না করার সময় এক লাখ পাঠিয়ে দিতে হয়, এরপর ওয়াজে বসার আগে পঞ্চাশ হাজার আর ওয়াজের মধ্যবর্তী এক সময়ে বাকি পঞ্চাশ। হেলিকপ্টার ভাড়া আলাদা। এ টাকা দেওয়া তার এই মাদরাসার জন্য কোনো বিষয় না। বিষয় হলো এই সিজনে তার নাগাল পাওয়া। এখন তার ব্যবসা রমরমা। মুহতামিম বলল, 'আমরা তো আর টাকা কম দিমু না। সে যা চায়, তাই দিমু। চেষ্টা করতে দোষ কী?' সপ্তাহখানেক বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে হেলিকপ্টার হুজুরের সেক্রেটারি মুফতি আলমগীরের নাগাল পাওয়া গেল। মুফতি আলমগীর এই মাদরাসা থেকেই হেফজ করেছে। তার ডেট পাওয়া গেল সামনের মাসের ১৭ তারিখ। হাতে এক মাসের মতো সময় আছে। আগামী দুই দিনের মধ্যেই পোস্টার-ব্যানার ইত্যাদি করে প্রচারে নামতে হবে। কালেকশনে নামতে হবে। কালেকশনের বড় অংশ করবে মাদরাসার ছাত্ররা।

এ বছর মাহফিল উপলক্ষে ২৫ লাখ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পরদিন থেকেই কালেকশনে ছাত্ররা নেমে পড়ল। ভাগ করে দেওয়া হলো কোন দল কবে কোথায় কাজ করবে। এই একমাস মাদরাসায় তেমন পড়াশোনা হবে না। যা হবে রাতে। দিনে শুধুই কালেকশন। দিনের বেলা সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে কোনো দিন রাত দশটা পর্যন্ত চলবে কালেকশন। মাদরাসার আশপাশে তিন দিকে তিনটা বাসস্ট্যান্ড রয়েছে। সেখানে ছাত্ররা হ্যান্ডমাইক-ব্যানার আর লিফলেট নিয়ে থাকবে রাত দশটা পর্যন্ত। বাড়ি বাড়ি যাবে দুই-তিনজনের ছোট ছোট দল।

প্রথম দুইদিনের আয়ে একটু হতাশই হলো মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ নওশাদ চৌধুরীর ভাতিজা মোস্তাক। রাত এগারোটার পর 'পানিপুনি' খেতে খেতে আজকের দিনের আয়ের খোঁজ নিল নওশাদ চৌধুরী। মোস্তাক জানাল তেমন ভালো না। মুহতামিম বলল, 'কাইল সইন্ধ্যার মইধ্যে লিফলেট-ব্যানার হাতে পায়া যাবে সব ছাত্র। তখন দেখবি মাইনষে ট্যাকা দিবো

বেশি। খালি হাতে ট্যাকা দিতে চায় না। বাঙ্গালি হইল সাজগোজে বিশ্বাসী। ব্যানারে যহন হেলিকেপ্টার হুজুরের ছবি দেখব, তহন দানের হাত খুইলা যাইব'।

মাহফিলের ব্যানার-লিফলেট-পোস্টার করতে কোনো খরচ হয় না। তিন প্রেস মিলে এসব ছাপিয়ে দেয় বিনা পয়সায় –কিছুটা সোয়াবের আশায়, কিছুটা নামের আশায় আবার কিছুটা পাপ কাটানোর জন্য।

সকাল থেকে মাহমুদের পেট ভীষণ ব্যথা করছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। মাহফিলের কালেকশনে যেতেই হবে। তাদের দলে আজ পড়েছে হেফজখানার ছাত্র জুয়েল ভাই। সে কমিটির সহসভাপতি গফ্ফার পাটোয়ারীর দূরসম্পর্কের শ্যালক। এই জোরে সে সারা মাদরাসায় মাস্তানি করে বেড়ায়। তার বয়স সতেরো আঠারোর বেশি। পাঁচ বছর ধরে সে হেফজখানায় পড়লেও এখন পর্যন্ত দশ পারাও মুখস্থ করতে পারেনি। তাকে কোনো হুজুর কিছু বলে না। প্রায়ই তাকে ছোট ছাত্রদের মশারির মধ্যে নানা কায়দায় পাওয়া গেলেও তার কোনো বিচার হয় না। মাহমুদের প্রতি জুয়েলের আলাদা খায়েশ আছে। এ পর্যন্ত মাহমুদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সে ওই নোংরা কাজটি করেছে। না করলে মারে, হাত ধরে মোচড় দেয়, আজেবাজে কথা বলে। মাহমুদ মনে মনে ঠিক করেছে, একদিন বড় হয়ে সে এই জুয়েল হারামজাদাকে খুন করবে। আর যদি নিজে না-ও করতে পারে তো যেদিন মাহমুদের টাকা হবে, সেদিন টাকা দিয়ে খুন করাবে জুয়েলকে। মাহমুদের হেফজ শেষ। আর কিছুদিন পর সে পাগড়ি নেবে। কিন্তু তারপরও জুয়েল হারামজাদা মাহমুদের সঙ্গে নোংরা কাজটা করবেই। নোংরা মানুষের নোংরা কাজ। এমন নোংরা মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত নয় বলে মনে করে মাহমুদ। বেঁচে থাকা উচিত না হাদিসখানার মুফতি মোক্তার হুজুরেরও। সে-ই তো আলাদা পড়া দেখানোর কথা বলে মাহমুদের সঙ্গে ওই জঘন্য কাজটা করেছে। তার দুইদিন পর এক সন্ধ্যায় এই জুয়েল এসে ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই সেদিন মোক্তার হুজুরের লগে যা যা করছস, সব কিন্তু আমি দেখছি'। একথা শুনে থতমত খেয়ে গেল মাহমুদ। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। 'কী করছি আমি? আমি তো হুজুরের কাছে পড়া দেখতে গেছিলাম। সাতাইশ পারায় আমার একটু বাজে, তাই গেছি।' এর জবাবে জুয়েল ওর হাত মুচড়ে ধরে বলল, 'ওরে খানকি মাগি, তুই কি মনে করছস আমি কিছু দেহি নাই? তুই পরথম...' এরপর হাফেজ মোক্তার হুজুর ওর সঙ্গে যা যা করেছে, সবই বলে গেল একে একে। সব শুনে মাহমুদ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। বুঝতে পারল ও ধরা পড়ে গেছে। জুয়েল ওর কান্না থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এহন আর কাইন্দা কী অইবো? আমি তো সবাইরে কইয়া দিমু'। এ কথা শুনে কান্না আরও বেড়ে গেল। জুয়েল এদিক-সেদিক তাকিয়ে মাহমুদের গালে চকাস করে এক চুমু দিয়ে বলল, 'মোক্তার হুজুরের লগে যা যা করছস, তাই তাই আমার লগে একবার করবি, তাইলে আর কাউরে কমু না। আর যদি না করস, তাইলে হুদা মাদরাসার ছাত্ররা না, আকাশ-পাতাল, গাছপালা, পাখপাহালি সবাই জাইনা যাইব, হিহিহি...'। সেই থেকে শুরু। এরপর অন্তত বিশবার জুয়েল মাহমুদকে ধর্ষণ করেছে। একবার ভেবেছে মোক্তার হুজুরকে সব বলে দেবে। কিন্তু তাতে ঝামেলা আরও বাড়তে পারে। তাহলে কী করবে এখন মাহমুদ? এ কষ্ট তো আর সহ্য হয় না। একদিকে মোক্তার

হুজুর, আরেকদিকে জুয়েল। জুয়েল ওসব করার সময় মাহমুদকে অনেক ব্যথা দেয়। মাহমুদের মনে হয়েছে জুয়েল ইচ্ছা করেই ব্যথা দেয় মাহমুদকে। তবে এখন ব্যথা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে ওর কাছে। ও না পারে কইতে, না পারে সইতে। মাহমুদ ঠিক করেছে, এরপর এমন করলে আর ছেড়ে দেবে না। কিছু একটা করবে একদিন। এতিম হলেও তো মাহমুদ মানুষ। জুয়েল কেন ওর সঙ্গে এমন আচরণ করবে? কেউ কি জানে মাহমুদকে কত্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়? প্রতিবার হিক্কা তুলে কাঁদে ও। টয়লেট করতে কষ্ট হয়। কিন্তু জুয়েল কিছুই শোনে না। সে ওই সব করার আগে ইন্টারনেট থেকে ওই সব ভিডিও দেখে নেয়, মাহমুদকেও দেখায়। তারপর মাহমুদের সঙ্গে ওই রকম করতে চাপাচাপি করে। না করলে নানা রকম ভয়ভীতি দেখায়, মারে। তখন মাহমুদের আরও বেশি কষ্ট হয়। কিন্তু কাউকে কিছুই বলতে পারে না ও। কারণ, মাহমুদের এই মাদরাসা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই।
সঙ্গে করে নিয়ে আসা একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডিং টেবিল, দুটি চেয়ার, ব্যানার, কিছু লিফলেট, একটা হ্যান্ডমাইক–এসব সাজিয়ে ওরা বসল বাসস্ট্যান্ডে। এখানে বসে মাইকে টাকা চাইবে মানুষের কাছে, আর যখন বাস থামবে, তখন বাসে উঠে যাত্রীদের কাছে চাইবে দুজন। এটা কোনো বাসস্ট্যান্ড নয়। থানা সদর থেকে জেলায় যাওয়ার একটা স্টপেজ মাত্র। যাত্রী ওঠানামা করে শুধু। বিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট পরপর দুই দিক থেকে বাস আসে। জুয়েল হ্যান্ডমাইকে বলছে, 'ইসলামদরদি তৌহিদি মুসলমান ভাইয়েরা, আসছে আগামী ১৭ই...'
কালেকশন ভালোই হচ্ছে। ব্যানার টাঙানো হয়েছে একটা। একজন মানুষের হাতে লিফলেট দিয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টার হুজুর আসবে বলে গতবারের চেয়ে এবারের কালেকশন ভালো হচ্ছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বড় সাইজের ব্যানারটা দেখছে। ওরা দলে তিনজন– জুয়েল, মাহমুদ আর আরিফ নামের একটা ছেলে। তবে আরিফ যেমন বয়সে মাহমুদের চেয়ে বড়, তেমনি গায়ে-পায়ে-বুদ্ধিতেও আগানো। এখানে যে টাকা জমবে, সে টাকা ওরা গুনেও দেখতে পারবে না। নিয়ম নেই। এ টাকা সরাসরি চলে যাবে কোষাধ্যক্ষের কাছে। যে কয়দিন মাহফিলের জন্য কালেকশন চলবে, সে কয়দিন দুপুরে ওদের খেতে একটু কষ্ট হবে। এ কথা বড় হুজুর বলে দিয়েছে। দুপুরে ওদের কোনো দিন রুটি-কলা আবার কোনো দিন চিড়া-গুড় দেওয়া হয়। আজ দুপুরে ওদের পাউরুটি আর কলা দেওয়া হয়েছে। তাতে মাহমুদের পেটের কোণাও ভরেনি। একজন একজন খেয়ে পাশের মসজিদে সালাত আদায় করে করে আসছে। সালাত আদায় করার পর মাহমুদ টের পেল ওর আবার ক্ষুধা লেগেছে। তবে ওর এতে কোনো সমস্যা নেই। ও জানে এই কষ্টের বিনিময়ে ওর জন্য চিরশান্তির জান্নাত রয়েছে মৃত্যুর পর। আসরের নামাজের কিছু আগে জুয়েল আর আরিফ কোথায় যেন গেল। অনেক সময় পর যখন ফিরল, তখন মাহমুদ বুঝতে পারল দুজনেই পেট পুরে খেয়ে এসেছে। মাহমুদের কাছ থেকে হ্যান্ডমাইক নিয়ে জুয়েল বলতে শুরু করল, 'ইসলামপ্রিয় তৌহিদি জনতা...'
আরিফকে এক ফাঁকে একা পেয়ে মাহমুদ বলল, 'কী খাইয়া আইলা দুইজন মিল্লা?' এমন প্রশ্ন শুনে খেপে গেল আরিফ।

– তোরে কেডায় কইছে খাইয়া আইছি? তুই খাইতে দেখছস?
– না, খাইতে তো দেখি নাই, তয় তোমার দাঁতের ফাঁকে মাংস হাইন্দা রইছে, ওইডা বাইর করো। পাউরুডি আর কলায় তো আর মাংস থাহনের কতা না।
মাহমুদের এমন কথায় লজ্জা পেয়ে গেল আরিফ। নিজের অজান্তেই ওখানে জিব চলে গেল ওর। খাওয়ার সময়ই আরিফ বুঝেছিল এই রগ টাইপের মাংস ওকে বেশ জ্বালাবে। বের হচ্ছিল না কিছুতেই।
– আরে জুয়েল ভাই নিয়া খাওয়াইল, কী করুম কও?
আরিফ মাহমুদের কাছাকাছি সময়েই হেফজ ভর্তি হয়েছে। দুজন বন্ধু। তবে এত ভালো বন্ধু না যে জুয়েলের অত্যাচারের কথা সে আরিফকে বলতে পারে। জুয়েল আবার এসে মাইক টেনে নিয়ে বলতে শুরু করল। রাত দশটার দিকে ওরা যখন ফিরবে, তখন দেখল অনেক টাকাই উঠেছে। আরিফ বলল, 'দশ-পনেরো হাজার টাকা তো হবেই'। একথা শোনার সঙ্গেসঙ্গে জুয়েল একটা কষে চড় বসিয়ে দিল আরিফের গালে। 'এই মাউল্লার বাচ্চা, দশ-পনেরো আজার ট্যাকা জীবনে চউক্ষে দেখছস? এইগুলো তো প্রায় সবই দুই ট্যাকার নোট।'
এরপর মাদরাসায় ফেরা পর্যন্ত কেউ আর জুয়েলের সঙ্গে যেচে কথা বলল না।

মাহফিলের তহবিল সংগ্রহের জন্য সবাই বের হয়ে যায় সকাল ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে। এরপর মাদরাসা একদম ফাঁকা হয়ে যায়। শুধু বাবুর্চি মন্টু রান্না করে দুপুরে হুজুরদের জন্য আর রাতে সবার জন্য। কিন্তু মাদরাসায় আর কেউ না থাকলেও কয়েকটি শিশু আছে, যাদের কয়েকজনের পায়ে আর কয়েকজনের গলায় শিকল দিয়ে পশুর মতো বেঁধে রাখা হয়েছে। ওদের অপরাধ, ওরা কেউ এই মাদরাসায় থাকতে চায় না। এদের সবার বয়স আট থেকে এগারোর মধ্যে। এরা সবাই এক জায়গায় না। কেউ দোতলায়, কেউ একতলায়, কেউবা আলাদা বিশেষ রুমে।
নয় বছরের সগীর যেখানে বাঁধা আছে, সেখানে অন্য কেউ নেই। এমনিতেই সবাই তহবিল সংগ্রহে গিয়েছে। রুমে ও একাই আছে এখন। সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে আর মাঝেমধ্যে চোখের পানি ফেলে। পড়ার সময় সকলের সঙ্গে পড়ে। এখন তহবিল সংগ্রহের সময় বলে সারাদিন একা একা বসে থাকে। একটু আগে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সগীর। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার পায়ের শিকল খোলা! খুবই অবাক হলো ও। আশপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। শিকলটা এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ও। সত্যিই কি মাদরাসায় কেউ নেই? এদিক-সেদিক উঁকি মেরে দেখল, নাহ্, কোথাও কেউ নেই। তাহলে কি ওর সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে? আজ কি সগীর এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে? বুকটা দুরুদুরু করে কাঁপছে ওর। দোতলা দিয়ে নামার সময় সিঁড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখে ও একতলাতেই আছে। আস্তে আস্তে সগীর বেরিয়ে গেল মাদরাসার সীমানা পেরিয়ে। আসলেই কি তাই? সত্যিই পালাতে পেরেছে ও? সগীর এবার আর বাড়িতে যাবে না। গেলে ওকে আবার দিয়ে যাবে। বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের রাস্তায় দিল ভোঁ দৌড়! দৌড়াতে দৌড়াতে আমবাগান ছাড়াল, প্রাইমারি স্কুল ছাড়াল, বাজারের কাছাকাছি এসে মনটা আনন্দে নেচে উঠল ওর। এখন ও অনেক মানুষের ভিড়ে মিশে যাবে। তখন ওকে আর পায় কে? কিন্তু সগীর আর দৌড়াতে পারছে না। পা ধরে এসেছে। আর অল্প কিছু সামনেই বাজার। এতটুকু জায়গা যেন আর ফুরাচ্ছেই না। যতই দৌড়ায়, পথ যেন আর আগায় না। পা একদম ধরে এসেছে। আর পারছে না। একটা গাছের ছায়ায় বসল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। গাটা জুড়িয়ে গেল ওর। এমন সময় কে যেন মৃদু স্বরে ডাক দিল ওকে। সগীর সেদিকে ফিরে তাকাতে চায় না। ওর অনেক প্রস্রাব পাচ্ছে। আবার ডাকল কেউ। আবার... এবার তার দিকে ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দেখে সগীরের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কবীর হুজুর, যার আরেক নাম আজরাইল হুজুর, যে কিনা মাদরাসার শৃঙ্খলার বিশেষ দায়িত্বে রয়েছে। কে কোথায় খেলতে যায়, কাকে অন্য ছাত্রের মশারির মধ্যে পাওয়া গেল, কে টিভি দেখল, কে খেলতে গেল, কে কে ঝগড়া করল, কে পালাতে চায় –এই সব দেখার দায়িত্ব এই আজরাইল হুজুরের ওপর

ন্যস্ত। হাফেজ মাওলানা কবীর ওস্তাদকে সবাই গোপনে ডাকে আজরাইল হুজুর। সে ছাত্রদের মারার সময় রাগে হিসহিস করে আর বলে– এক্কারে জান কবোজ কইরা ফালামু।
কবীর মাওলানাকে দেখে উঠে বসল সগীর। ওর মাথায় পরম মমতা নিয়ে হাত রেখে আজরাইল মাওলানা বলল, 'কী রে? জ্বর আসছে নাকি?'
– না হুজুর।
– এই রকম আর কয়দিন পায়ে শিকল নিয়া থাকবি?
এমন প্রশ্নের কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না সগীর। এই কবীর মাওলানার কাছে শিকল দেওয়া ছাত্রদের চাবি থাকে, সে কথা সগীর জানে। তবে কি আজ ওর শিকল খুলে দিতে এসেছে কবীর মাওলানা? হতেও পারে। তাই হয়তো আল্লাহ্ পাক সগীরকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছে। হুজুরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে সগীর বলল, 'হুজুর, একটু এস্তেনজায় যাব'।
কবীর মাওলানা ফ্লোরের হুক থেকে শিকল খুলে নিল। তারপর এক মাথা ধরে সগীরের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোর শিকল খুইলা দিলে আবার পালাইয়া বাড়িত যাইবি না তো?' কবীর পেছনে মুখ ঘুরিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'হুজুর, আমি কোথাও যামু না, আমারে এইবার ছাইড়া দেন, আমার খুব কষ্ট হয়'।
– আচ্ছা ছাইড়া দিমু, একটা শর্ত আছে।
– কী শর্ত? বলেন হুজুর, আমি সব শর্ত মাইনা চলুম।
– আগে এস্তেনজা কইরা আয়, পরে কইতাছি।
বাথরুমে ঢুকে উত্তেজনায় সগীরের প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আহ্! মুক্তি! প্রস্রাব শেষ করে বাইরে বের হয়ে আবার সগীরকে ওর নিজের জায়গায় নিয়ে গেল কবীর মাওলানা। তারপর শিকলের মাথা আংটার সঙ্গে লাগাতে লাগাতে বলল, 'কী রে? শিকল থাকবে এমন? না খোলাবি?'
– জ্বি হুজুর, বলেন কী শর্ত? আমি সব শর্ত মানতে রাজি।
– সব শর্ত?
– জ্বি হুজুর।
কবীর মাওলানা সগীরের কাছাকাছি এসে বলল, 'কাউরে বলবি না তো?' ছোট্ট সগীরের মনে মুক্তির আশা। তার সামনে এখন কল্পনার উন্মুক্ত প্রান্তর। হুজুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহান আল্লাহ্ পাকের কসম হুজুর, কাউরে কিছু কমু না'।
– আচ্ছা, তাইলে একটু উপুড় হইয়া শো।
মুক্তির আশায় শিশু সগীর তা-ই করল। হাফেজ মাওলানা কবীর সগীরের কাছে গিয়ে নিজের শক্তিশালী পা দিয়ে ওর দুই পা চেপে ধরে টান দিয়ে ওর ইলাস্টিক দেওয়া পাজামা নামিয়ে নিল গোড়ালি পর্যন্ত। নিজের লুঙ্গিটা খুলে রাখল পাশে। একটা জান্তব চিৎকারে বিদীর্ণ হলো শান্ত দুপুর। কিন্তু সগীরের আর মুক্তি ঘটল না। কাজ শেষে হাফেজ মাওলানা কবীর হুজুর জানাল, শিকল আরও পরে খোলা হবে। তবে যা হয়েছে, তা যদি কাউকে বলে তবে জীবনেও মুক্তি মিলবে না। আর সগীর তো মহান আল্লাহ্পাকের নামে কসম খেয়েছে। কারও কাছে এসব বললে সগীরের ভীষণ ক্ষতি হবে, তা হুজুর যাওয়ার আগে সগীরকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

◆ ০৭ ◆

মাহফিল উপলক্ষে মাদরাসা প্রাঙ্গণে একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ বিরাজ করছে, যা টগরের ভালোই লাগছে। টগর প্রতিদিন সবার সঙ্গে তহবিল কালেকশনে যায়। হাঁটতে একটু কষ্ট হয় বটে, তারপরও ভালো লাগে। হেলিকপ্টার হুজুর হেলিকপ্টার নিয়ে ওদের মাদরাসার মাঠে নামবে, এটা ভাবতেই ওর গা খুশিতে শিউরে উঠছে। মনে মনে ভাবে, বড় হলে সে-ও একজন বক্তা হবে। অনেক বড় বক্তা। তারপর সে-ও একটা হেলিকপ্টার কিনবে। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওয়াজ করবে। টগররা আজ একটা বাজারে এসেছে কালেকশনে। এখানে আজ বাজারের দিন। ওরা যথারীতি বাজারের এক প্রবেশপথে বসেছে। মাইকে যে কথা বলছে, সে ওদের অনেক বড় ছাত্র ভাই। নাম আব্দুস সালাম। কেতাবখানার ছাত্র। সে খুবই ভালো মানুষ। সবাই বলে পুরো মাদরাসায় একমাত্র এই আব্দুস সালাম ভাইয়ের লুতি কওমের অভ্যাস নেই। সকালে বাজারে আসার পর সে সবাইকে রসগোল্লা আর পরোটা খাইয়েছে। সে কখনো কাউকে গালাগাল করে না। ওদের দলে আরেক বড় ভাই আছে, তার নাম আবু ইউসুফ। সে-ও মাইকে বলে। তবে সালাম ভাইয়ের মতো অত সুন্দর করে বলতে পারে না। 'দ্বীনি ভাইয়েরা আমার' বলে সালাম ভাই সুর করে একটা টান দেয়, যা টগরের খুব ভালো লাগে। আজ এখানের কালেকশনও বেশ ভালো। 'এই বেলুন বেলুন' বলে এক লোক ঢুকল বাজারে। তার হাতে অনেকগুলো নানা রঙের বেলুন। লাল, নীল, হলুদ কমলা নানা রঙের বেলুন। ইশ্, টগরের যদি টাকা থাকত, তাহলে সবগুলো বেলুন কিনে ফেলত। বাবা বাড়িতে আসার সময় ওর জন্য কত কী নিয়ে আসত! তার মধ্যে এমন অনেক বেলুনও থাকত। পরক্ষণেই টগরের মনে পড়ল বড় হুজুরের কথা। বড় হুজুর বলেছে, বেলুন নিয়ে খেলা তো দূরের কথা, যে বেলুন নিয়ে খেলার কথা চিন্তা করবে, সে জাহান্নামি জাহান্নামি জাহান্নামি। টগর মনে মনে তওবা করে নিল। তওবা পড়লেও টগর সেই সব দিনের কথা ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না বাবার কথা। বাবা প্রতিবার আসার সময় অনেক কিছু নিয়ে আসত। গাড়ি, স্পিনার, টেনিস বল...। একবার একটা মাটির ঘোড়া এনেছিল। লাল রঙের। কী সুন্দর দেখতে! টগর সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রাখত। আর মনে মনে ভাবত, বড় হয়ে একটা জ্যান্ত ঘোড়া কিনবে। তারপর ঘোড়াটা চালিয়ে যাবে অনেক দূর...।

এখন আর ওসব ভাবে না। ভাবে না টিভি দেখার কথাও। ওসব হারাম। ইহুদি-নাসারারা ওসব বানিয়েছে শুধু মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য। টিভি দেখা কবিরা গুনার কাজ। অবশ্য কবিরা গুনা হলেও এখনো মাঝেমধ্যে তার দেখতে ইচ্ছা করে। একসময় মটু-পাতলু না দেখলে, ডরিমন না দেখলে ভাত খেতে পারত না টগর। যেদিন কারেন্ট থাকত না, সেদিন মা অনেক মজার মজার গল্প বলে টগরকে ভাত খাওয়াত। এখন আর ওসব মোটেও ভাবে না সে। ওসব ভাবলেও এখন তার কান্না পায়।

এখন তার ভাবনা সে হাফেজ হবে। তারপর হবে অনেক বড় মাওলানা, হবে বক্তা। হেলিকপ্টার হুজুরের মতো একটা বড় দেখে হেলিকপ্টার কিনে দেশে দেশে ঘুরবে আর ওয়াজ করবে।

দুপুরের ক্ষুধায় টগরের পেট চোঁ চোঁ করছে। সারা দিনে সকালে ওই পরোটা আর রসগোল্লা ছাড়া আর কিছুই খায়নি। এখন যত দ্রুত পারে মাদরাসায় যেতে চায় ও। সেখানে গিয়ে রাতে ভাত খাবে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাজার ভেঙে যায়। গ্রামাঞ্চলের বাজার, তার ওপর নেই বিদ্যুৎ। ওরা দেখল বেশ ভালোই টাকাপয়সা উঠেছে। টগর জীবনেও এতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখেনি। এক টাকার কয়েন থেকে শুরু করে হাজার টাকার নোট পর্যন্ত আছে। এখন ওরা সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে রওনা হবে বলে। ওদের মাদরাসা এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। অতখানি পথ হেঁটে যেতে হবে ভাবতেই টগরের কষ্ট হলো। তারপরও সিনিয়র ছাত্র ভাই আব্দুস সালামের নেতৃত্বে দলটি মাদরাসার দিকে এগিয়ে চলল।

সন্ধ্যার পর মাদরাসায় বেশ থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। বড় হুজুরের রুমের সামনে ছয়-সাতজন সিনিয়র ছাত্র দাঁড়ানো। রুমের মধ্যে কমিটির সভাপতি নওশাদ চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটরসাইকেল। সেখানে একজন সেপাই হাতে বন্দুক নিয়ে সিগারেট টানছে। মাওলানা কবীর আর মাওলানা সোহেল বড় হুজুর, অর্থাৎ মুহতামিমের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সভাপতি নওশাদ চৌধুরীর সামনাসামনি বসা চেক হাফশার্ট গায়ে দেওয়া লোকটা বলল, 'নওশাদ ভাই, আপনে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমার তো কিছুই করার নাই। আমি আইজ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে এমন কিছু করছি? আপনি দরকার হলে ওসি স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলেন। তয় মনে হয় না ওসি স্যার কিছু করতে পারবে। উপর থেকে ম্যালা চাপ আসছে'।

– দেখেন দারোগা সাব, আপনে আমার লগে জোরাজুরি কইরেন না, কইরা পারবেন না। আপনার কী মনে হয়? আমার এই এতগুলা ছাত্রের সামনে আপনে এই দুই মাওলানারে নিতে পারবেন? আর কয়েকদিন পর মাহফিল। এই সময় মাদরাসার মান-ইজ্জত লইয়া আপনে টানাটানি করবেন? করেন...বুইঝেন, আমিও ছাইড়া দিমু না। খালি ওসির লগে না, দরকার হইলে আমি সার্কেল এসপির লগে কথা কমু।

এরপর সে মোবাইল বের করে আলতাফ ব্যাপারীকে ফোন করল। অলতাফ ব্যাপারী এই মাদরাসার কমিটির সেক্রেটারি। ঘটনা হলো, এই মাদরাসার এমদাদুল নামের এক ছাত্রকে ভয়ংকরভাবে নির্যাতন করেছে দুই শিক্ষক। কে বা কারা সেই নির্যাতনের ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ঢাকা থেকে কোনো এক মানবাধিকারকর্মী সেই ভিডিও দেখে সেই দুই শিক্ষক হাফেজ মাওলানা কবীর আহমেদ আর হাফেজ সোহেল রানার পরিচয় বের করে মামলা করেছে। অনেকগুলো অনলাইন পত্রিকা তা সংবাদ আকারে প্রকাশও করেছে, যার সঙ্গে সেই ভিডিও দেওয়া হয়েছে। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সেই নির্যাতক দুই শিক্ষককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে। মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতনের আওতায় পড়ে। জামিন-অযোগ্য মামলা। নওশাদ চৌধুরী আলতাফ ব্যাপারীকে দিয়ে একে একে সার্কেল এসপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত কথা বলিয়েছে। এরপর ওসির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি রেডি, দেখি আমার ছাত্রের সামনে আপনি দুইজনরে ক্যামনে নিয়া যান। হইয়া যাউক ক্ষমতার শোডাউন। কার কত ক্ষমতা'।

এর মধ্যে মাঠে এক গাড়ি পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতসব হুমকি-ধমকি আর ফোনের কাছে অসহায় এসআই ফিরে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'আপাতত আমি আর ওসি স্যার উপর সামাল দিতেছি। আমি যাইয়া কমু আসামি পাই নাই। তত দিন আপনে পারিবারিকভাবে কেসটা মিটাইয়া ফালাইতে চেষ্টা করেন'।

একথা বলার পরও নওশাদ চৌধুরী তাদের একেবারে খালি হাতে পাঠাল না। পুলিশ বিদায় নেওয়ার পর মুখ ছুটল নওশাদের। অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকল সবাইকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভিডিওটা ফেসবুকে ছাড়ল কে? মাদরাসায় তো এর চেয়েও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় প্রায়ই। সেটা ভিডিও করল কে? সবাই ধারণা করল, যেহেতু বাইরে বসে এসব হয়েছে, তাই বাইরের কেউ ভিডিও করে আপলোড করেছে। এরপর কঠিন নির্দেশনা এল, মাদরাসার বাইরে এরপর আর যেন কোনো ছাত্রের গায়ে ফুলের টোকাও না দেওয়া হয়। সবকিছু ঠাণ্ডা হতে রাত বারোটা বেজে গেল। হাফেজ মাওলানা কবীর আর হাফেজ মাওলানা সোহেল রানার স্থান হলো নওশাদ চৌধুরীর আলিশান বাড়ির এক ঘরে। পুলিশকে বিশ্বাস করে না নওশাদ। যে কোনো সময় যদি ওদের ধরে নেয়, তাহলে মাদরাসার মান-সম্মান আর থাকবে না। এই মাদরাসা তাকে সম্মানের চূড়ায় তুলেছে। সুদি নশু থেকে বানিয়েছে আলহাজ নওশাদ চৌধুরী। সে হয়েছে ইসলামের সেবক। এই মাদরাসার কল্যাণে সে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হতে পেরেছে, হতে পেরেছে চেয়ারম্যান। শেষ বছর না হয় নিজের লোকের কূটচালে হেরেছে। সেই মাদরাসার সম্মান সে কোনোভাবেই খাটো করতে পারবে না। কোনো কালি লাগতে দেবে না মাদরাসার গায়ে। এর জন্য তার যা দরকার, সে তা-ই করবে। যত নিচে নামতে হয়, নামবে। এর আগেও নেমেছে।

সে অনেক দিন আগের কথা। তারপরও পুরো ঘটনা মনে আছে নওশাদ চৌধুরীর। তখন শীতকাল। রাত বারোটার ওপরে বাজে। গ্রামাঞ্চলে রাত আটটার পরই সুনসান নীরব হয়ে যায়। মড়ার মতো ঘুমায় পুরো গ্রাম। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল নওশাদ চৌধুরী। হঠাৎ তার রুমের দরজায় আঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল তার। বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেখে খাস চাকর সোবাহান দাঁড়িয়ে। 'কী বিষয়? এত রাইতে দরজা ধাক্কাও ক্যা?' 'বড় হুজুর আইছে, আপনারে বোলায়, জরুরি কতা আছে।' নওশাদ চৌধুরী বুঝতে পারল না এত রাতে মুহতামিম কী চায়। আবার কোনো দুর্ঘটনা? আবার কোনো ছাত্র আত্মহত্যা করেছে? কোনো কিছু বুঝে উঠতে না পেরে নওশাদ চৌধুরী বাড়ির সদর দরজা খুলে দেখে এই শীতে মুতহামিম একটা লুঙ্গি আর একটা কোরা গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে আছে। হারিকেনের আলোয় নওশাদ চৌধুরী দেখতে পেল মাওলানা দরদর করে ঘামছে আর থরথর করে কাঁপছে।

– কী হইছে মাওলানা?

– একটু আবডালে আহেন, গুফোন কতা আছে।

– কোনো ঝামেলা?

– হ, নাইলে এত রাইতে আপনারে জ্বালাই?

সোবাহানকে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নওশাদ মুহতামিমকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গলাটা একটু খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে মাওলানা, কও তো?'

– আপনে তো জানেন রাইতের বেলা আমার খেদমতের জন্য একজন ছাত্র আমার লগে থাহে।

– হ, জানি, আসল কতা কও।

– আইজ তো একটু বেশি ঠাণ্ডা, তাই তারে আমি মাডিতে না রাইখ্যা আমার খাটে উঠাইয়া শোয়াইছি।

– আরে হাউয়া, আসল কতা হও। কী হইছে?

মুহতামিম তখন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি ইমান ধইরা রাখতে পারি নাই, হু হু হু,' মাওলানা জোরে কেঁদে উঠল।

– আরে ঢং চোদাইয়ো না, তুমি যে ইমান ঠিক রাখতে পারো না, হেইডা তো পুরান কথা, কচি পোলা তোমার কোন খেদমত করে, হেইডা তো জানি, আসল কতা কও। কী হইছে? বাইরের কেউ দেইখ্যা ফালাইছে?

– না, তার চাইতেও খারাপ ঘটনা।

– আরে চুতমারানির পোলা, কী হইছে, হেইডা কবি তো? বেয়ান রাইত আমি রামায়ণ হুনতে আহি নাই।

– কাম শেষে ওই পোলা কান্নাকাটি শুরু করল, আর কইল সকালবেলা সে সবাইরে কইয়া দিব। আমি খুব ভয় পাইয়া গেছিলাম। এলাকায় আপনার অসিলায় আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় আমার কত

মান-সম্মান! তা ছাড়া আমার সংসার আছে, আল্লায় আমারে দুইডা সন্তান দিছে। ওর কতায় আমি খুবই ভয় পাইয়া গেলাম।
– তারপর?
– পরে...মানে আমি...হইছে কি, বোঝেনই তো, আমি খুব ভয় পাইয়া গেছি। আমি ওর মুখের উপর বালিশ চাইপা ধরলাম। কতক্ষণ ছটফট করল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। মনে হয় ও এন্তেকাল ফরমাইছে।
এ কথা শোনার সঙ্গেসঙ্গে নওশাদ চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। এবার নওশাদ চৌধুরীর দুই পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল মাওলানা।
– আপনে আমারে বাঁচান, আপনে আমার আব্বা। আজীবন আপনার গোলামি করুম, আব্বা। আমারে ফাঁসির হাত থাইকা বাঁচান, আব্বা।
নওশাদ চৌধুরী ঝানু মাল। জীবনে খুনখারাবি করে নাই, এমন না। তবে নিজের হাতে কিছুই করে নাই। হাত নোংরা করার মতো মানুষ সুদি নশু না। মাথা নিচু করে কিছু সময় ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ছাত্র কি এতিম?'
– জ্বি জ্বি এতিম।
– লও আমার লগে। মাথা ঠাণ্ডা রাহো। আমি তো আছি, নাকি?
মুহতামিম কৃতজ্ঞতায় আবার নওশাদ চৌধুরীর দুই পা জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন চুমু খেতে লাগল। তখন মুহতামিম মসজিদের দোতলায় একটা ঘরে থাকে। রুমের কাছাকাছি গিয়ে কাঁপুনি বেড়ে গেল মুহতামিমের। নওশাদ চৌধুরীর হাতে রুমের চাবি দিয়ে বলল, 'আপনে খোলেন, আমার খুব ভয় করতাছে'। দরজার খুলতে গিয়ে নওশাদ দেখল তার নিজেরও হাত কাঁপছে। দরজা খোলার পর দুজনেরই নাকে একটা দুর্গন্ধ এসে লাগল, মানুষের বিষ্ঠার গন্ধ। ঘরের হারিকেনের আলোয় দেখল আট-নয় বছরের একটি ফুটফুটে শিশু মরে পড়ে আছে। গায়ে কিছু নেই, পরনে একটা ইলাস্টিক দেওয়া পাজামা। শিশুটি মৃত্যুর সময় পায়খানা করে দিয়েছে। 'সর্বনাশ! কী করছ মাওলানা? তোমার কলিজায় কি একটু দয়ামায়াও নাই? তোমার নিজের না দুইডা সন্তান আছে?' মাওলানা নওশাদ চৌধুরীর দুই পা জড়িয়ে ধরে আবার হাউমাউ করে কেঁদে দিল। আর বলতে থাকল, 'আমারে বাঁচান, আমার উপর ইবলিশ শয়তান ভর করছিলো, আমারে বাঁচান। আমার ফাঁসি হইব, আমারে ফাঁসির হাত থাইকা বাঁচান'।
এরপর দুজন মিলে মাদরাসার পুকুরের পশ্চিম পাশে হালকা চাঁদের আলোয় বেশ গভীর করে একটা কবর টাইপের গর্ত খুঁড়ল। এরপর দুজনে জানাজা দিয়ে শিশুটিকে মাটিচাপা দিয়ে মাটি সমান করে দিয়ে তার ওপর শুকনা পাতা ছড়িয়ে দিল। মুহতামিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খেয়াল রাইখো মাওলানা, তোমার ছাত্ররা যেন এই দিকে না আহে। আর সময় কইরা একদিন এর উপর পাকিস্তানি লতা লাগাইয়া দিয়ো। পাকিস্তানি লতা ধ্যার ধ্যার কইরা বাড়ে।
পরদিন শুক্রবার সকালে মাদরাসার ছাত্ররা জানাল নাজেরা বিভাগের ছাত্র এমরানকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই দিন স্থানীয় বাজারের দিন। সারা বাজারে এমনরানের নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করল মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। জুমার নামাজের সময় মুহতামিম এতিমের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে, তা নিয়ে বেশ বয়ান করল। কোরানে আর সহিহ্ হাদিসে কোথায় কোথায় এতিমের বিষয়ে কী বলা আছে তাও বয়ান করলো। বয়ান করল দিনের নবীর এতিম জীবন নিয়ে। আর সেসব বয়ান করতে গিয়ে কেঁদেকেটে মুহতামিম তার দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে

ফেলল। মুসল্লিয়ানএকরামরাও সে কান্নায় যুক্ত হয়েছিল। আসরের দিকে মুহতামিমের মনে হলো, আল্লার অশেষ রহমতে সে বেঁচে গেছে। আর ঝামেলা নেই। এশার নামাজ শেষে সে ভরপেট খেয়ে নতুন এক খাদেম নিয়ে নিদ্রা গেল।
এর মাসখানেক পর শিশুটির ভিক্ষুক নানি এসেছিল ওর খোঁজে। তখন উল্টো তাকে ধমকে দেওয়া হয়েছে। 'তোমরাই ওরে মাদরাসা থাইকা নিয়া গেছ। এখন আবার আইছো জিগাইতে? যাও, ভাগো! ফহিন্নি কোহানকার!' এরপর বেশ কয়েকবার এমরানের নানিকে মাদরাসার আশপাশে ঘুরতে দেখা গেছে কিছুদিন। তারপর আর না।
এই ঘটনায় মাঝখান থেকে নওশাদ চৌধুরীই বেশি লাভবান হয়েছে। মাওলানাকে দিয়ে নানা রকম 'দোষের কাম' করিয়ে নিতে পেরেছে। এরপর সত্যিই মুহতামিম নওশাদ চৌধুরীর পা-চাটা গোলাম হয়ে গেল। এরপর যখন মাদরাসা বড় হলো, সেখানে নওশাদ চৌধুরীর জন্য আলাদা ঘর হলো। সেখানে নওশাদ চৌধুরী বিশ্রাম করে, 'পানিপুনি' খায়। তখন তার খেদমতে থাকে ৮-১০ বছরের কোনো ছাত্র। তাদের কেউ চিৎকার করে, কেউবা মুখ বুজে সহ্য করে। তবে কেউই বাইরে মুখ খোলে না। যেন এমনটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

নওশাদ চৌধুরী আর আলতাফ ব্যাপারী খুব সহজেই ছাত্র নির্যাতনের কেস হাওয়া করে দিল। হাফেজ কবীর মাওলানা আর হাফেজ সোহেলের নামে কোনো কেস তো নাই-ই, উল্টো যে কেস করেছিল, সেই মানবাধিকারকর্মীকে পুলিশে ধরেছে ৫০০টি ইয়াবাসহ। এর পেছনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে আলতাফ ব্যাপারীর এক পুলিশ ভাগনি জামাই। কবীর মাওলানা আর সোহেল মাওলানা এখন মুক্ত। নওশাদ চৌধুরীর বাড়ি থেকে তারা মাদরাসায় চলে এসেছে।

ক্রমেই মাহফিলের দিন ঘনিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকল কালেকশনের জন্য ছাত্রদের পরিশ্রম। কালেকশন দলের বড় ছাত্র ভাইরা বলাবলি করছে, এবারের কালেকশন যেকোনো বারের চেয়ে বেশি। এর সবচেয়ে বড় কারণ হেলিকপ্টার হুজুর আসবে। ছাত্ররা যে সকল জায়গায় বসে হ্যান্ডমাইকে বলে বলে তহবিল সংগ্রহ করে, সেখানে প্যানা সাইনের বেশ বড় আকারের একটা ব্যানার থাকে। তাতে নানা রকম লেখা রয়েছে। ইসলামের বিকাশের জন্য, আল্লাহ্‌র জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দানের ফজিলতের ওপর ছোট্ট একটা হাদিসও লেখা রয়েছে। আর রয়েছে হেলিকপ্টার হুজুরের ছবি। তাতে সে হেলিকপ্টারের দরজা খুলে কালো চশমা পরিহিত আচকান গায়ে হাস্যোজ্জ্বল চকচকে ছবি, যা ব্যানারের তিন ভাগের দুই ভাগ জায়গা দখল করে আছে।

একজন প্রখ্যাত ইসলামি বক্তা আসবে ওয়াজ করতে। তাকে কেন হেলিকপ্টার ভাড়া করে আসতে হবে, সেই প্রশ্ন কারও মাথায় আসে না। বরং তার হেলিকপ্টারে আসা উপলক্ষে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ইসলামপ্রিয় তৌহিদি জনতা। গ্রাম থেকে ছাত্ররা আগে তহবিল সংগ্রহ করেছে, এখন মাহফিল উপলক্ষে বিশেষ তহবিল সংগ্রহে নামে ছাত্ররা। তারা ভ্যান নিয়ে 'মানত' সংগ্রহে যায়। গ্রামের বিভিন্নজনের বিভিন্ন মানত থাকে। যেমন কারও জমিতে ফসল হচ্ছে না, সে মানত করল, 'ইয়া আল্লাহ্, ভালো ফসল দাও, ওমুক মাদরাসার মাহফিলে দুইমণ ধান দেব'। কিংবা কারও গাছে প্রথম কাঁঠাল হয়েছে, সে-ও হয়তো মানত করে রেখেছে প্রথম কাঁঠাল মাদরাসার এতিমখানায় দেবে। মাদরাসার নিজস্ব চারটি ভ্যান আগেই ছিল। মাহফিল উপলক্ষে নওশাদ চৌধুরীর এক শালা আরও দুটি ভ্যান দিয়েছে। যারা মানত সংগ্রহে যায়, তাদের সঙ্গে কিছু তালিকা থাকে, যা মানতকারীরা আগেই দিয়ে যায়। সেই মোতাবেক ছাত্ররা ভ্যান নিয়ে নামে তা সংগ্রহ করতে। তেমনই একটি দলের সঙ্গে আজ টগর আছে। আজ টগরের মন খুব খারাপ। গতকাল ছবক দেওয়ার সময় আবু মোক্তার হুজুর খুব মেরেছে। টগর চিৎকার করে কেঁদেছে। সকালে টয়লেটে বসতেও কষ্ট হয়েছে ওর। হুজুরেরা সব সময় পাছার ওপরে মারে, যাতে কাউকে দেখাতেও না পারে। তবে আশার কথা, টগর খুব দ্রুত আগাচ্ছে। অন্য সবাই যত মার খায়, ও ততটা মার খায় না। ওরা সকালে গরম ভাত-ডাল আর আলুভর্তা খেয়ে বেরিয়েছে। সারাদিন মানত সংগ্রহ

করে সন্ধ্যায় ফিরবে। সেই সন্ধ্যার অপেক্ষায় আছে টগর। অপেক্ষার কারণ দুটি। প্রথমত সংগ্রহ শেষে মাদরাসায় গিয়ে একটু খাবে, আরাম করবে আর দ্বিতীয়ত কবীর হুজুর তাকে জিন দেখাবে বলেছে। জিন সম্পর্কে টগর খুব ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু শুনেছে। জিনের অনেক ক্ষমতা। তারা যখন যেমন ইচ্ছা আকার ধারণ করতে পারে। মানুষের জন্য ভালো-মন্দ সবই করতে পারে তারা। এ-ও শুনেছে যে মানুষের মধ্যে যেমন ভালো মানুষ খারাপ মানুষ থাকে, তেমনি জিনেদের মধ্যেও ভালো জিন খারাপ জিন থাকে। তবে জিনদের যত ক্ষমতাই থাকুক, মানুষ তাদের বশে আনতে পারে। অবশ্য সবাই পারে না। এর জন্য মানুষের থাকতে হয় বিশেষ ক্ষমতা। সবার সেই ক্ষমতা থাকে না। যারা খুব ভালো মানুষ, যারা আল্লাহ্‌র খাস পেয়ারের বান্দা, তারাই কেবল জিন বশে আনতে পারে। কবীর হুজুর আল্লাহ্‌র সেই বিশেষ পেয়ারের বান্দা। তাকে আল্লাহ্ জিন বশে আনার সেই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। তার রয়েছে জিন জাতির ওপর বিশেষ দখল। এটা শুধু মাদরাসার লোকে জানে না, আশপাশের গ্রামের মানুষও জানে। যদি কাউকে দুষ্ট জিনে আসর করে, তবে কবীর হুজুরের ডাক পড়ে সেই জিন ছাড়াতে।

টগর একদিন হুজুরের ঘরে গিয়েছিল তার খেদমতে। তখন হুজুর তাকে বলেছিল সিলিং ফ্যানের পাশে ছাদে আয়াতুল কুরসি লেখা আছে। মাকড়সার জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে ওইখানে যেন ঝাড়ু না লাগে। টগর ততদিনে যেকোনো আরবি লেখা দেখে দেখে পড়তে পারে। ও দেখল সেখানে লেখা রয়েছে,"আল্লাহুলা ইয়া হাইয়ুল কাইয়ুম লাতা খুজহু সেনাতু আলা নাউম। লাহুমা ফিসসামাওয়াতি...।" টগরের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না ওখানে অত উঁচুতে হুজুর কী করে লিখল। হুজুরের রুমে একটা খাট আর দোকানের ক্যাশবাক্সের মতো একটা বাক্স ছাড়া আর উঁচু কিছুই নেই। এসবের ওপর দাঁড়িয়ে ওখানে লেখা সম্ভব নয় মোটেই। টগর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে হুজুরকে জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর,ওইখানে কীভাবে লিখেছেন?' কবীর হুজুর বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি লিখি নাই, জিনে লিখছে'। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টগরের বুকটা ধক করে উঠল। মনে মনে 'লা হাওলা' পড়ে বুকে ফুঁ দিল। এত দিন সে জিনের কথা শুনেছে কেবল। আজ নিজ চোখে জিনের কাজ দেখল। দেখে সে অবাক ও বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি খানিকটা ভয়ও পেল। কবীর হুজুরকে এমনিতেই সবাই ভয় পায়, আড়ালে-আবডালে তাকে আজরাইল হুজুর ডাকে। তার ওপর সে জিন দিয়ে কাজকর্ম করায়। বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবল টগর। টগরের মনোভাব দেখে কবীর হুজুর নিজেই বলল, 'আমি তো জিন পুষি, জানস না? জিন দিয়ে নানা রকম কাজকর্ম করাই'। তখন টগরের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাহলে খেদমতের জন্য কেন এই ছোট ছোট ছাত্রদের ডাকে? জিন দিয়ে খেদমত করালেই তো পারে। প্রশ্নটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলল টগর। ওস্তাদদের ছাত্র দিয়ে কাজ করানোর একটা বড় কারণ, যাতে ছাত্ররা জান্নাতে যেতে পারে। এমন কথা হুজুরেরা অনেকবার বলেছে। 'এই যে তোমরা আমাদের খেদমত করো, এতে আমাদের চেয়ে তোমাদেরই উপকার বেশি হয়। তোমরা যখন আমাদের খেদমত করো, তখন তোমাদের জন্য জান্নাতের বাগানে একটি সুশীতল ছায়াদায়ক সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ রোপণ করা হয়। তোমরা আমাদের যেসব কাজ করো, তা কি আমরা

নিজেরা করতে পারি না? অবশ্যই করতে পারি। তারপরও তোমাদের সুযোগ দেই, কারণ, আমাদের খেদমত করলে তোমাদের জান্নাত নিশ্চিত। তোমাদের বাবা-মায়েরা যখন আমাদের হাতে তোমাদের পবিত্র কোরআনের হাফেজ বানাতে দিয়ে যায়, তখন কিন্তু বলে, হুজুর, আমার ছেলেটারে আপনার খাদেম বানাইয়া নেবেন। কেন বলে? কারণ, তারাও চায় তোমরা যাতে ওস্তাদের সেবা কইরা জান্নাত নিশ্চিত করতে পারো। আর আমরাও তোমাদের সেই সুযোগ দেই, যাতে তোমরা আমাদের খেদমত করে তোমাদের জান্নাত নিশ্চিত করতে পারো'। খেদমতের ব্যাপারে সব হুজুরই ঘুরেফিরে একই ওয়াজ করে। 'আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন প্রতিযোগিতা কইরা ওস্তাদগো সেবা করতাম। কে কত আগে ওস্তাদগো জন্য কিছু করতে পারি। নাসারাগো খেলা ক্রিকেট, যা তোমাগো খেলতে নিষেধ করি, দেখতে নিষেধ করি, তারপরও তোমরা দেখো, সেই খেলায় দেখছ না ব্যাটম্যান যখন ব্যাট দিয়া বলটা মারে, তহন এক পার্টি ক্যামনে দৌড়াইয়া যায় বলটা ধরতে, আমরাও ওই রকম দৌড়াইয়া যাইতাম ওস্তাদগো খেদমত করতে, কে কার আগে যাইতে পারি। আর এহোন তোমাগো তো চিল্লাইয়াও ফাওন যায় না'। ওস্তাদের খেদমত নিয়া এমন বয়ান রেগুলার ওস্তাদরা দেয়। ফলে নামাজ-রোজা এই শিশুদের কাছে যতটা না ফরজ, তার চেয়ে বেশি ফরজ ওস্তাদের সেবা করা, ওস্তাদ যা বলে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। আর সেই খেদমতের মধ্যে থাকে ওস্তাদের কাপড়চোপড় ধোয়া, তার জন্য খাবার নিয়ে রাখা, তাদের জুতা পরিষ্কার করা, ঘরদোর পরিষ্কার করে দেওয়া, গুছিয়ে রাখা সব। এসব ছাড়াও ওস্তাদদের নানা রকম দুষ্টু চাহিদাও থাকে। আর সেসব সেবাও করতে হয় মুখ বুজে। না হলে পরকালে জান্নাত তো মিলবেই না, উপরন্তু ইহকালে মিলবে ভয়ংকর শাস্তি।
টগরদের প্রাপ্ত দান-খয়রাত জমা করতে করতে এশা হয়ে গেল। এশার নামাজ শেষে কবীর হুজুর টগরকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল, 'কী রে? জিন কি আইজই দেহা লাগব?' টগর মুচকি হেসে বলল, 'জ্বি হুজুর'। কবীর হুজুর এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'জিন দেহার কথা আর কাউরে কইছস নাকি?'
'না হুজুর, আপনি তো কইতে নিষেধ করলেন।' এরপর কবীর হুজুর টগরকে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়ে দিল। খুব ভালো করে পবিত্র হতে বলল। বলে দিল ভালো করে সুন্নতের সঙ্গে গোসল করতে। শরীরের নাপাক জায়গা, এস্তেনজা করার জায়গা ভালো করে ধুতে বলল। অজু করে সবচেয়ে ভালো পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরে আসতে বলল। শরীরে বা মনে একটা ছিটে পরিমাণ অপবিত্রতা নিয়ে জিনেদের শত ডাকলেও সাড়া দেবে না, একথাও বলে দিল। আর যদিও কোনো জিন আসে, তা আসবে বদজিন, দুষ্ট জিন, যা মানুষের ক্ষতি করে সব সময়। টগর হুজুরের কথামতো পাকপবিত্র হয়ে জুমার জন্য রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে যখন কবীর হুজুরের দরজায় তবিয়তের সঙ্গে মৃদু আঘাত করল, তখন রাত দশটার কাছাকাছি। কবীর হুজুর অতি সাবধানে টগরকে রুমে ঢুকিয়ে দরজা লাগাতে লাগাতে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কাউরে কও নাই তো?'
– জ্বি না, হুজুর।

অতিরিক্ত পবিত্রতার জন্য কবীর হুজুর টগরকে আরেকবার অজু করতে বলল। অজু করে এসে টগর দেখে ওস্তাদ খাটের ওপর কোরআন শরিফ নিয়ে বসেছে। টগরকে তার সামনে বসতে বলল। একটা বাটিতে রাখা পবিত্র পানি ঘরময় ছিটিয়ে দিল। তারপর বলল, 'একদম ভয় পাবি না। এই জিন আমার পোষা জিন। খুবই ভালো, ভদ্র'। তবে টগরের মনে বা শরীরে যদি একটুও অপবিত্রতা থাকে, তাহলে দুয়েকটা দুষ্ট জিন ঘরে ঢুকে পড়ে খারাপ কিছু করতেই পারে। সার কথা হচ্ছে, খারাপ-ভালো যা-ই হোক, রুমের মধ্যে যা কিছু হবে, তা বাইরে কাউকে কিছুই বলা যাবে না। তাহলে জিন রাগ করে টগরকে বা কবীর হুজুরকে মেরেও ফেলতে পারে। এমন অনেক নির্দেশনা শেষে কবীর হুজুর রুমের লাইট নিভিয়ে সুরা জিন পড়া শুরু করল। পড়া শেষ হতেই আশপাশে জানালা-দরজায় শব্দ হতে লাগল। ভয়ে টগরের গায়ের সব কটি পশম দাঁড়িয়ে গেল। কবীর ওস্তাদ টগরকে ফিসফিস করে বলল, 'জিন আইছে, সালাম দে'। টগর ভয়ে জমে গেল। তারপরও সালাম দিল। একটু সময় নিয়ে একটি খনখনে গলা টগরের ঠিক মাথার ওপর থেকে সালামের জবাব দিল। টগরের সে জবাব শুনে ভয়ে সবকিছু জমে গেল। সে থরথর করে কাঁপছে। হুজুর সেটা টের পেয়ে বলল, 'ভয় পাইসনা, আমি তো আছি'। এরপর জিন মাথার ওপর থেকে বলল, 'বল টগর, তোর প্রিয় ফুল কী?' টগর কোনো কিছু না ভেবেই বলল, 'গোলপ ফুল'। অমনি একটি গোলাপ ফুল পড়ল টগরের মাথার ওপর। এবার টগরের ভয়ের সঙ্গে বিস্ময় যুক্ত হলো। সে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। কবীর ওস্তাদ টগরের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কোহেকাফের মিষ্টি খাবি?' টগর বলল, 'জ্বি ওস্তাদ,খাব'। তখন কবীর ওস্তাদ গম্ভীর গলায় জিনকে হুকুম করল, 'আমার ছাত্র মিষ্টি খাবে, যাও, ওর জন্য কোহেকাফ থেকে সুস্বাদু মিষ্টি নিয়ে এসো'। সঙ্গে সঙ্গে জিন মিষ্টি নিয়ে হাজির হলো। সেই মিষ্টি খেয়ে টগরের মনে হলো, এমন স্বাদের মিষ্টি সে জীবনেও খায়নি। এরপর জিন খনখনে গলায় টগরের মাথার ওপর থেকে বলল, 'হুজুর, যদি আপনার আর কিছু চাওয়ার থাকে তো বলেন, আমার হাতে বেশি সময় নাই'। কবীর ওস্তাদ আবার টগরকে বলল, 'জিনের কাছে কিছু চাইলে এখন চা'। টগর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি তাড়াতাড়ি হেফজ শেষ করতে পারি'। জবাবে জিন আগের জায়গা থেকে একইভাবে বলল, 'সব সময় কবীর ওস্তাদের কথা শুনবা, সে যা বলে, তা-ই মান্য করবা। তার কোনো কথাই অমান্য করবা না। তাহলেই তোমার মনে আশা পূরণ হবে। তাড়াতাড়ি হেফজ শেষ করতে পারবা। কবীর ওস্তাদের কোনো কথা কখনো অমান্য করলে অনেক বিপদ, অনেক বিপদ। কথা শুনলে অনেক লাভ, অনেক লাভ। আজ আসি, আসসালামু আলাইকুম'। ওস্তাদের রুম থেকে ফিরে টগরের সারা রাত ঘুম হলো না। মাথায় কেবল জিনের বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকল। কত্ত ক্ষমতা! মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মাইল দূরের কোহেকাফ থেকে টগরের জন্য মিষ্টি এনে দিল। এত ক্ষমতাধর জিনকে কবীর হুজুর পোষ মানিয়ে রেখেছে, তাইলে হুজুরের কত ক্ষমতা! টগর মনে মনে ভাবছে, ও যখন বড় হবে, তখন সে-ও কবীর ওস্তাদের মতো জিন পুষবে।

টগরের পাশের বেডে দুই দিন হলো রায়হান এসেছে। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটু বন্ধুত্বও হয়েছে। পাশে বিছানা আনার পর বন্ধুত্বটাও একটু বেড়েছে। টগর ঘুমায়নি টের পেয়ে রায়হান ফিসফিস করে টগরকে বলল, 'এত রাতে জাইগা আছ? সিনিয়র ছাত্র ভাইরা জানতে পারলে পিডাইয়া পাছার চামড়া লাল কইরা দিব'। ওদের থাকার জায়গার শৃঙ্খলার দায়িত্বে আছে জসিম নামের দাওরায়ে হাদিসের এক ছাত্র। খুব খারাপ লোক সে। সেদিন জসিম রায়হানের মশারির মধ্যে ঢুকে ওকে জোর করে চুমু দিয়েছে। আর বলেছে, 'তোর সঙ্গে কে কে প্রেম খেলায়, তা জানি। আমারে প্রেম খেলাইতে না দিলে আমি কিন্তু সবাইরে কইয়া দিমু'। বলে দাঁত বের করে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসেছে। প্রেম খেলা কী, তা জানে রায়হান। একদিন মোক্তার হুজুরও জোর করে ওর সঙ্গে প্রেম খেলেছে। রায়হান খুব ব্যথা পেয়েছে। রায়হানের ডাকে ওর মতোই ফিসফিস করে করে সাড়া দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে টগরের কানে কানে রায়হান বলল,'আমি আর এই মাদরাসায় পড়মু না। আম্মারে কইছি। যদি আম্মা অন্য মাদরাসায় না দেয়, তাইলে আমি পালাইয়া যামু। আমারে একটু হেল্প করবা?' কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল টগরের। মাদরাসা থেকে পালাতে চাওয়া খুবই ভয়ংকর অপরাধের মধ্যে পড়ে। যারা পালাতে গিয়ে পালাতে পারে না, তাদের সবাইকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এই তহবিল সংগ্রহের মধ্যে ইমাম হোসেন নামে নাজেরার এক ছাত্র পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তার পরিণতি দেখে বাবুর্চি মন্টু ভাই পর্যন্ত কেঁদেছে। পাকা জোড়া বেতের বাড়িতে তার চামড়া উঠে এসেছে। মারের পর জ্বরে সারা রাত কাতরালেও তাকে না নেওয়া হয়েছে ডাক্তারের কাছে, না দেওয়া হয়েছে একটা ট্যাবলেট। মার খেয়ে কোনো ছাত্র অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানোর নিয়ম নেই এখানে। শেষে ইমাম হোসেনকে সগীর, নাইমসহ আরও অনেকের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তবে ইমাম হোসেনের শিকল দেওয়া হয়েছে গলায়। প্রথমে ধরার পর ইমাম হোসেনকে কবীর ওস্তাদ আর জিহাদি ওস্তাদ দুই দিক থেকে ধরে ছিল আর মুহতামিম হুজুর নিজ হাতে মোটা লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল। পেটাতে পেটাতে যখন ইমাম হোসেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখন সবাই ভেবেছিল সে মরে গেছে। মাদরাসায় কেউ অন্যায় করলে তাকে সবার সামনে শাস্তি দেওয়া হয়, যাতে অন্য সবাই সেই শাস্তির ভয়াবহতা দেখে ওই অন্যায় করতে আর সাহস না পায়। ইমাম হোসেনকে পেটাতে রায়হান নিজেও দেখেছে। তারপরও সে কোন সাহসে মাদরাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে, তা টগরের মাথায় আসে না। টগর রায়হানের কোনো কথার জবাব দিল না। রায়হান যখন কথাটি আবার বলল, তখন টগর বলল, 'এসব চিন্তা মাথায় জায়গা দিয়ো না, রায়হান। শয়তান তোমারে ওয়াসওয়াসা দিছে। তুমি মনে মনে তওবা পড়ো'। টগরের এমন কড়া উপদেশের সামনে রায়হান এ বিষয়ে আর কোনো কথাই বলতে পারল না। কিন্তু রায়হান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সে এই মাদরাসায় আর পড়বে না। তার সঙ্গে সোহেল হুজুর, জিহাদি ওস্তাদ প্রতিদিন প্রেম খেলতে চায়। হাদিসখানার দুজন বড় ছাত্র একদিন তাকে ধরে নিয়ে তিনতলায় এসব কাজ করেছে। রায়হানের যে কী কষ্ট হয়, তা কেবল রায়হানই জানে। সে কষ্টের কথা রায়হান

আর কাউকে বলতে পারবে না। আব্বু-আম্মুকেও না। দরকার হলে মরে যাবে, তারপরও কাউকে বলবে না। কিন্তু এই মাদরাসায় রায়হান পড়বে না।

রায়হানের আব্বু-আম্মুর ইচ্ছা রায়হান হাফেজ হোক। রায়হান ওর আম্মুকে ভীষণ ভালোবাসে। ও চায় আম্মুর স্বপ্ন পূরণ হোক। কিন্তু তা এই মাদরাসায় পূরণ হওয়ার নয়। এখানে থাকলে রায়হান একদিন মরে যাবে। কিন্তু কাউকে কোনো দিন কিছু বলতে পারবে না। তার চেয়ে বরং অন্য মাদরাসায় যাবে ও।

◆ ১৩ ◆

মাহফিলের আর তিনদিন বাকি। মাঠে বিশাল স্টেজ বানানোর কাজ চলছে। ডেকোরেটর থেকে আনা সালু কাপড় দিয়ে ধীরে ধীরে বানানো হচ্ছে মাহফিলের মঞ্চ। মাদরাসায় মাহফিল মানে এক উৎসব। হেলিকপ্টার হুজুর আসবে বলে সেই উৎসবের পালে অতিরিক্ত বাতাস লেগেছে।
এবছর তহবিল সংগ্রহ হয়েছে বিগত বছরগুলোর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সেকথা সিনিয়র ছাত্রভাইরা বলাবলি করছে। সেই তহবিল নিয়ে কমিটির লোকেদের সঙ্গে মাদরাসার শিক্ষকদের সঙ্গে হালকা মনোমালিন্য চলছে, তা ছাত্ররা টের পেয়েছে। মাদরাসার পেছনে বাঁধা আছে ৪৫টি গরু, শ খানেক ছাগল, গোটা ত্রিশেক ভেড়া। এসবই মাহফিলে দান করেছে মানুষ। গরু-ছাগল-ভেড়া ছাড়াও দানের মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে। ধান, চাল, হাঁস, মুরগি, সুপারি–কী নেই? মাদরাসার বড় গুদামঘর ছাড়াও আরও চার-চারটি ঘরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু করে রাখা হয়েছে সেই সব দানের সামগ্রী। এবছরের দান যে ইতিহাসের সকল মাহফিলের দানকে ছাড়িয়ে গেছে, তা সবাই বলাবলি করছে। বিশেষ করে শিক্ষকেরা। গতবছর যেখানে গরু দান করেছিল মাত্র ৯টি, এবছর সেখানে ৪৫টি। ভাবা যায়? প্রায় পাঁচ গুণ! সে গরুর সবচেয়ে ছোটটিরও বাজারমূল্য আছে কম করে হলেও চল্লিশ হাজার টাকা। যে ধান চাল উঠেছে, তা এই মাদরাসার সব ছাত্র খেয়ে আগামী তিন বছরেও শেষ করতে পারবে না। এলাকার দুই-দুইটা চাতালের মালিক মিলন তালুকদারের নামে চাতালের মহিলা ধর্ষণের কেস আছে তিন-তিনটা। মিলন তালুকদারের বক্তব্য, তাকে ফাঁসানো হয়েছে। এটা তার জন্য আর তার চাতালের জন্য এক ভয়ংকর বালা-মুসিবত। এই বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য সে-ও মাদরাসায় ৫০ বস্তা চাল দিয়েছে।
মাহফিলের দুই দিন আগের ঘটনা। আসরের নামাজের পর সবাই কাজ করছে। মাঠে শামিয়ানা লাগানোর কাজ। কেউ বাঁশ কাটছে, কেউ বাঁশ পোঁতার জন্য গর্ত খুঁড়ছে, কেউ দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ করছে। নানা কাজে সবাই মহা ব্যস্ত। বড় বড় ভারীভারী কাজ করছে সিনিয়র ছাত্র ভাইরা। এলাকার যেসব জায়গায় বাজারের দিন, আজও সেসব জায়গায় তহবিল সংগ্রহ করতে গেছে বেশ কয়েকটি দল। কাজের প্রচুর চাপ। আর সে জন্য বড় হুজুর তথা মুহতামিম হুজুর কমিটির মাধ্যমে অন্যান্য মাদরাসা থেকেও ছাত্র আনিয়েছে। মাগরিবের নামাজের শেষেও অনেক কাজ হবে। এই উপলক্ষে ভালো খানাপিনার আয়োজন আছে। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। ফলে একটু ভালো খাবারের বিনিময়ে ছাত্ররা মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে।
মাহমুদও কাজ করছে একটি দলের সঙ্গে। এমন সময় জুয়েল তাকে হাতের ইশারা দিয়ে ডাকল। কাছে যাওয়ার পর বলল, 'তিনতলার ছাদে আসিস, জরুরি কথা আছে'। 'তিনতলায় এখন কাজ চলছে। সেখানের ছাদে যে পানির ট্যাংক হবে, সে জায়গায় সহসা কেউ যায় না। কিন্তু জুয়েল মাহমুদকে সেখানে নিয়ে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করেছে। আজও তেমন কিছু একটা করবে ভেবে মাহমুদ 'কাজ আছে, যেতে পারব না' বলে দিল। জবাবে জুলেয় জানাল, যদি না যায় তো মাহমুদকে পরে ভয়ংকর আফসোস করতে হবে। 'যা ভাবছস, সেসব কিছু না। শফিপুর আর বাবু নগর মাদরাসা থাইকা আমার যে বন্দুরা আইছে, তারা নতুন কিছু ভিডু দিছে। তরে দেহামু বইলাই আইতে কইতাছি। এহন চিন্তা কইরা দেখ আবি, না আবি না। না আইলে কিন্তু

তোরই লস’। জুয়েল একই কথা বলার পর মাহমুদ আর না করতে পারল না। মাহমুদ জানাল, বাদ মাগরিব সে তিনতলায় যাবে। মাহমুদকে জীবনে প্রথম ‘ওই সব’ ভিডিও জুয়েলই দেখিয়েছে। ‘ওই সব’ ভিডিও দেখতে মাহমুদের অনেক ভালো লাগে। মাদরাসায় মোবাইল চালানো কবিরাহ গুনার শামিল। কিন্তু জুয়েল মোবাইল চালায়। সে মাদরাসার সহসভাপতি গফ্ফার পাটোয়ারীর দূরসম্পর্কের শালা বলে জুয়েলের জন্য সবই হালাল। জুয়েল কোনো অপরাধ করলে তাতে শিক্ষকেরা তেমন গুরুত্ব দেয় না। খুব বেশি মারাত্মক কোনো অন্যায় করলে বড়জোর ধমকটমক দেয়। ফলে মাদরাসাজুড়ে জুয়েল নানা ধরনের মাস্তানি করে বেড়াতে পারে। শুধু জুয়েলই নয়, এমন এখানে অনেকেই আছে। কেউ বড় হুজুরের শালা, কেউ অমুক হুজুরের ভায়রাপো, কেউ ওমুক ওস্তাদের ভাগনে, কেউ কমিটির আত্মীয়। এদের যন্ত্রণায় মাদরাসার সাধারণ ছাত্ররা সবসময় অতীষ্ট থাকে। বিশেষ করে ছোট ছাত্ররা। এদের রাতে অন্যের মশারির মধ্যে পাওয়া গেলেও তেমন কোনো শাস্তি হয় না। বড় হুজুরের ভায়রাপো ফরিদকে অনেকবার অন্যের মশারির ভেতরে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কোনোদিন কোনো বিচার হয়নি। সেই ফরিদ এখন দাওরা পাস করে পাশের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করে। সেই ফরিদকে শেষবার যার বিছানায় পাওয়া গিয়েছিল, সেই ছেলেটিকে পিটিয়ে হাত ভেঙে দিয়েছিল। তারপর বের করে দিয়েছিল মাদরাসা থেকে। এমন হাজারও উদাহরণ আছে মাদরাসায়।

বাদ মাগরিব আর ত্বর সইছিল না মাহমুদের। ‘ওই সব’ ভিডিও দেখতে শত ভালো লাগলেও মাহমুদ দেখতে পারে না তার মোবাইল নেই বলে। এমন আরও অনেক ছাত্র রয়েছে যাদের ‘ওই সব’ ভিডিও দেখতে ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু নিজের কাছে কোনো ডিভাইস না থাকায় দেখতে পারে না। তখন স্মার্টফোনওয়ালা সিনিয়র ছাত্র ভাইরা ছোটদের ‘ওই সব’ ভিডিও দেখায় আর বিনিময়ে তাদের সঙ্গে কখনো কখনো ‘ওই সব’ কাজ করে। আর সে কাজ যে সব সময় জোরপূর্বক হয়, এমন নয়।

প্রথমবার দেখার আগে মাহমুদ কল্পনাও করতে পারেনি এমন কোনো ভিডিও থাকতে পারে। মাহমুদ ওস্তাদদের কাছে শুনেছে, সহবত শুধু নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে করা যায়, আবার তা-ও দেনমোহর আদায় করা স্ত্রীর সঙ্গে। দেনমোহর আদায় না করে স্ত্রীর সঙ্গে সহবত করলে যে সন্তান হবে, তা হবে জারজ। কিন্তু মোবাইলে ‘ওই সব’ ভিডিও দেখে মাথা নষ্ট হয়ে গেল মাহমুদের। কারা এসব করে? আবার কয়েকটি ভিডিওতে দেখেছে, একজন পুরুষ দু-তিনজনের সঙ্গে করে আবার একজন মহিলা দু-তিনজনের সঙ্গে করে। আবার এ-ও দেখেছে, পুরুষ পুরুষে করে। ওই সব ভিডিওতে যা দেখেছে, তা কল্পনাতে আনতে পারে না মাহমুদ। মানুষ এসব করে কী করে? তবে যে যা-ই বলুক, মাহমুদের দেখতে ভালোই লাগে। শুনেছে মাদরাসায় অনেকের কাছে লুকানো মোবাইল আছে আর তাতে রয়েছে ওই সব ভিডিও। সেসব নিয়ে মাঝেমধ্যে ধরাও পড়ে অনেকেই। একবার এক ছাত্র ধরা পড়ার পর জিহাদি ওস্তাদ বেত দিয়ে খুঁচিয়ে ওর চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল। মোবাইলটা নিয়ে গিয়েছিল ধ্বংস করে ফেলবে বলে। কিন্তু বেশ কিছু দিন পর ওই মোবাইল নিয়ে তার ছেলেকে বাজারে হাঁটতে দেখেছে মাদরাসার ছাত্ররাই।

মাহমুদদের ‘ওই সব’ ভিডিও দেখার একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা অনেকটা এ রকম–এক শুক্রবার ওরা শুনল যে বিক্ষোভ মিছিল আছে। এমন বিক্ষোভ মিছিল প্রায়ই হয় আর তা সবই আল্লাহ্‌র দ্বীন রক্ষার্থে। ফলে এইসব বিক্ষোভ মিছিলে যাওয়া, না যাওয়া নিয়ে ছাত্রদের কোনো

প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না কোনোকালেই। কিছুদিন আগেও ওরা আসাদ নূর নামের এক নাস্তিকের ফাঁসির দাবিতে পথে নেমেছিল। মিছিল করেছিল নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিন নামে একজনের ফাঁসির দাবিতে। লোপা রহমান নামের এক নাস্তিক মুরতাদ মহিলার ফাঁসির দাবিতে। তারা কারা, কোথায় থাকে, কী করে, এসব ওরা কিছুই জানে না বা জানতে চায়ও না। ওস্তাদরা বলেছে তাই তাদের ফাঁসির দাবিতে ওরা পথে নামে। ওস্তাদরা বলেছে, যারা নাস্তিক মুরতাদ, তাদের কতল করা ফরজ। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যাতা জিহাদি ওস্তাদ। সে প্রায়ই এই কতল বিষয়ে সহিহ্ হাদিস পড়ে শুনিয়ে থাকে। কিন্তু এখন যেহেতু এই সকল নাস্তিক মুরতাদকে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই কতল করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই শুধু বিক্ষোভ মিছিল করেই শান্ত থাকতে হয়। ঠিক তেমনই এক বিক্ষোভ মিছিলে যাওয়ার সূত্র ধরেই মাদরাসার কোমলমতি ছাত্রদের হাতে হাতে চলে যায় 'ওই সব' সহবতের ভিডিও। সেবার জুমার পর ওরা যার বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল, তার নাম 'সানি লিওন'। কে সানি লিওন, সে কোথায় থাকে, তার কী অপরাধ, তা ছোটরা কিছুই জানত না। কিন্তু জুমা নামাজের পর শুধু ওরা নয়, পুরো থানার সব মাদরাসার ছাত্ররা এসেছিল বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিতে। বিক্ষোভ মিছিলের মূল বিষয় ছিল সানি লিওনকে ৯৩% মুসলমানের মাটিতে পা রাখতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু ছোটরা টের পাচ্ছিল সানি লিওন লোকটার নাম নেওয়ার সময় বড় ছাত্র ভাইয়েরা খুব হাসাহাসি করছিল। আবার কেউ কেউ লজ্জাও পাচ্ছিল। কিন্তু মাহমুদের সাহস হয়নি কাউকে সানি লিওন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার। তবে বিষয়টি নিয়ে বিক্ষেভের বাইরে একধরনের চাপা কৌতুক কাজ করছিল সবার মধ্যে। কেউ কেউ শয়তানি হাসি হেসে বলছিল, ওস্তাদরা এত ভালো হইলে তারা সানি লিওনরে চিনল কী করে? তখন হাদিসখানার এক সিনিয়র ছাত্র ভাই বলল, 'মাদরাসার এমন কোনো ওস্তাদ নাই, যার মোবাইলে সানি লিওন আর মিয়া খলিফার ভিডিও নাই'। এই জুয়েলই তখন মাহমুদকে সানি লিওনকে চিনিয়েছিল। বিনিময়ে একবার-দুবার নয়, অনেকবার জুয়েল মাহমুদকে...
এরপর আস্তে আস্তে মিয়া খলিফাকে চিনেছে, নাতাশা মালকোভাকে চিনেছে, চিনেছে জনি সিন্সকেও। ওই রাতেই মাদরাসার ছোট ছাত্ররা সবাই সানি লিওনকে চিনে ফেলল। এমনকি প্রতি রাতের চেয়ে ওই রাতে বেশি করে সিনিয়র ছাত্র ভাইদের ছোট ছাত্রদের মশারির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যে যে কথাই বলুক না কেন, মাহমুদের 'ওই সব' সহবতের ভিডিও দেখতে ভালো লাগে। এমনকি জুয়েলের মারফত মাহমুদ ছেলে ছেলে জেনার ভিডিওও দেখেছিল। আজ হয়তো জুয়েল ওই রকম নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে এসেছে। মাহমুদ ফরজ নামাজ জামাতে শেষ করে সুরা কাওসার আর এখলাসের মতো ছোট সুরা দিয়ে দ্রুত সুন্নত নামাজ শেষ করে তিনতলার ছাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল মসজিদ থেকে। ভেতরে ওর অন্য রকম এক উত্তেজনা কাজ করছে। ছাদে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে দেখল কাজ করতে আসা অন্য এক মাদরাসার দুই ছাত্রসহ জুয়েল দাঁড়িয়ে আছে। তারাও জুয়েলের বয়সী। জুয়েলের মতো তাদের মুখেও ফিনফিনে পাতলা দাড়ি। এই দুজনই আগে এই মাদরাসায় পড়ত। বছর দুই আগে তাদের দুজনকে একে অন্যের মশারির মধ্যে 'আপত্তিকর' অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বলে পিটিয়ে মাদরাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। দুজনের হাতেই স্মার্টফোন। সে ফোন দেখে মাহমুদের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর যদি এমন একটা ফোন থাকত! ওরা চারজন ছাদে উঠে গেল। তিনতলার ছাদে ওঠা অত সহজ নয়। সিঁড়িতে রড বের হয়ে আছে। সিঁড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শ্যাটারিংয়ের বাঁশ, কাঠ, পেরেক ওঠা তক্তা। পানির ট্যাংকের পাশে যাওয়া তো

আরও কঠিন। অনেক কসরত করে উঠতে হয়। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। জুয়েলকে অন্য মাদরাসার ছাত্র নকীব বলল, 'কই, বাইর কর'। জুয়েল তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। সবাই মাথা থেকে টুপি খুলে পকেটে ঢোকাল। এসব ভিডিও দেখার সময় টুপি মাথায় রাখতে নেই। তাতে আরও বেশি পাপ হয় বলে ওদের ধারণা। তাই কম গুনার আশায় সবাই এসব দেখার সময় টুপি খুলে নেয়। চারটে মাথা ঝুঁকে আছে জুয়েলের মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে। জুয়েল প্লে বাটনে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ভিডিওটা চালু হলো, তার জন্য মাহমুদ কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হয়ে দেখল, ভিডিওতে আছে জুয়েল আর মাহমুদ নিজে। মুহূর্তেই পরিস্থিতি পরিবেশ পাল্টে গেল। ভিডিও দেখে মাহমুদ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মাহমুদের সঙ্গে 'ওই সব' কাজ করার সময় জুয়েল নিজেই কৌশলে ভিডিও করেছে। এই ভিডিও দেখে যারা জুয়েলকে চেনে না, তারা বুঝতে পারবে না যে ওটা জুয়েল। কিন্তু মাহমুদের চেহারা পুরোপুরি বোঝা যায়। মাহমুদের কান্না দেখে ওরা তিনজন হো হো করে হেসে উঠল। মাহমুদের মাথা ঝিমঝিম করছে। সে বুঝতে পারছে না কী করবে, কী বলবে। কোনো কিছু না বুঝেই ও জুয়েলের দুই পা জড়িয়ে ধরে আবারও হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। জবাবে জুয়েল বলল, 'আমার বন্দুগো লগে তুমি প্রেম প্রেম খেলাইবা। আর না খেলাইলে এই ভিডিও নেটে ছাইড়া দিমু'। মাহমুদ জানে, এই ভিডিও নেটে ছাড়লে জুয়েলের কোনো সমস্যা নাই। কারণ, জুয়েলের মুখ ওখানে এমনভাবে আসেনি, যা দেখে জুয়েলকে চেনা যায়। শুধু জুয়েলকে যারা ভালোভাবে চেনে, তারাই বুঝতে পারবে এটা জুয়েল। বারো বছরের কিশোর মাহমুদ চরম অসহায় হয়ে পড়ল তিনজনের কাছে। তার একমাত্র খালা ছাড়া ওর এই দুনিয়ায় আর কোনো স্বজন নেই। সেই খালার কাছে আগে মাঝেমধ্যে যেত সে। গত বছর খালার স্বামী মারা যাওয়ার পর আশ্রয়হীন খালা তার মেয়ের বাড়ি গাজীপুরের কোনাবাড়ী চলে গেছে। অর্থাৎ এই মাদরাসা ছাড়া মাহমুদের আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ভাবল মাহমুদ। বুঝতে পারল, এখানে থাকতে হলে জুয়েলের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তিনজন মিলে মাহমুদকে মোট ছয়বার ধর্ষণ করল। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে মাহমুদ রাতে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মনে মনে একটা কঠিন সিদ্ধান্তনিল ও। যা হওয়ার হবে। জ্বরের কথা বড় হুজুরকে জানালে সে মাহমুদকে উল্টো ধমক দিয়ে বলল, 'কাম না করার ধান্দা, তাই না?' মাহমুদ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

◆ ১৪ ◆

সেদিন সুদি নশুর কাছে মিথ্যা বলতে একটুও বুক কাঁপেনি আজকের মুহতামিমের। গুছিয়ে মিথ্যা বলায় সে ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ। মাদরাসার ওস্তাদদের কাছে যতটা গুছিয়ে মিথ্যা বলতে হয়, সাধারণ মানুষের কাছে অত গুছিয়ে মিথ্যা বলার দরকার হয় না, তা জানে মুহতামিম। একজন দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি পরা কোনো হুজুরের কথা নিয়ে কেউ সন্দেহ করে না, তাও জানে মুহতামিম। সাধারণ মানুষ তাদের কথা কোরআন-হাসিদের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে, সেটা মুহতামিম ছোটবেলা থেকে দেখেছে। অবিশ্বাস তো দূরের কথা, অবিশ্বাস করা যেতে পারে, এমন কথাও তারা চিন্তা করে না।

তার বাড়ি আসলে শেরপুর নয়, অন্য কোথাও। এখানে আসার আগেও সে একটা কওমি মাদরাসার মুহতামিম ছিল, একথা ঠিক, ছিল একটা মসজিদের ইমামও। তবে তার কোনো কিছুই নদীভাঙনে যায়নি। সে যে কওমি মাদরাসায় পড়াত, তার আশপাশে ১০ মাইলের মধ্যেও কোনো নদ-নদী নেই। মোটেই গরিব ঘরের সন্তান সে নয়। তার বাবা অবশ্য নেই, তবে মা আছে। তার বাবা ছিল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার। তার কোনো ভাইবোন নেই, এ কথাও ডাহা মিথ্যা। তার জন্মের আগ পর্যন্ত তার বাবা আবুল হাসেমকে ডাকা হতো আঁটকুড়া হাউস্যা। হাসেম মেম্বার আঁটকুড়া তকমা ঘোচাতে এক-এক করে পাঁচ-পাঁচটি বিয়ে করেছিল। পরপর তিনটি বিয়ে করেছিল অবিবাহিত মেয়ে। আঁটকুড়া হাউস্যার ধারণা ছিল, তার বিবিদের দোষের কারণেই সে বাবা হতে পারছে না। বংশের প্রদীপ বুঝি নিভে গেল। এই যে বিশাল সহায়-সম্পত্তি, তাকে খাবে? কে ধরে রাখবে তার সিলসিলা? তাই সে তিন বিবিকেই তালাক দিয়ে চতুর্থবার যাকে বিয়ে করল, সে অন্যের তালাক দেওয়া স্ত্রী, যার দু-দুটি সন্তান রয়েছে। সেই পরীক্ষিত নারী যখন তার ঘরে বিবি হয়ে গিয়ে সে-ও হাউস্যা মেম্বারের আঁটকুড়া তকমা ঘোচাতে পারল না, তখন অনেক শিক্ষিতজন হাউস্যা মেম্বারকে ডাক্তার দেখাতে পরামর্শ দেন। তখন হাউস্যা সবাইকে বলেছে, সন্তান দেওয়া না দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এ নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নাফরমান লোকের কাজ। ক্রমশ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল হাউস্যাকে। সে সর্বশেষ বিয়ে করল এই মুহতামিমের মা কৈতরি বেগমকে। কৈতরি অত্যন্ত সুন্দরী এক রমণী। বয়স মাত্র সতেরো। আর হাউস্যা দেখতে কুচকুচে কালো একজন মানুষ। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। চোখ দুটো দেখলে মনে হয় কেউ সজোরে তার গলা চেপে ধরেছে, এখনই তার চোখদুটো ফেটে বেরিয়ে আসবে। সে চোখে প্রেমও নেই, ক্রোধও নেই। তার মুখের আকৃতি অনেকটা গরিলার মতো। হাউস্যা খাস দেলে তার সঙ্গে সহবত শুরু করল। কিন্তু সে-ও যখন হাউস্যারআঁটকুড়া তকমা ঘোচাতে ব্যর্থ হলো, তখন অনেকের পরামর্শে শরণাপন্ন হলো আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের। গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'হুজুর, আমারে বাঁচান, আমারে এই আঁটকুড়া দুর্নাম থেকে বাঁচান'। আল্লামা আহমদ কাফি হাউস্যার আগের সব ইতিহাস শুনে বোঝার চেষ্টা করল তার সমস্যা

কী। এরপর সে হাউস্যাকে আশ্বাস দিল, আল্লাহ্‌র রহমতে সে সন্তানের বাবা হতে পারবে। এমন কাজ সে ভূরি ভূরি করেছে। এইটা কোনো ঘটনাই না। এরপর আল্লামা আহমদ কাফি তাকে বেশ কিছু পরামর্শ দিল, দিল কিছু শর্ত। তার খানকা ও এতিমখানার নামে ১০ বিঘা জমি লিখে দিতে হবে, স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই হতে হবে আল্লামা আহমদ কাফির খাস মুরিদ। আর আল্লার রহমতে হাউস্যার বিবির পেটে যে সন্তান আসবে, সেই সন্তানকে তারই মাদরাসায় পড়িয়ে বানাতে হবে হাফেজে কোরআন, দ্বীনের খাস সেবক। আঁটকুড়া হাউস্যা বিনা বাক্যব্যয়ে সব শর্ত মেনে নিল। চিকিৎসার জন্য তাদের যাতায়াত শুরু হলো আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের দরবারে। তবে হাউস্যার চেয়ে কৈতরিকেই বেশি চিকিৎসা নিতে হতো। হাউস্যাকে শুধু পানি পড়া খেলেই চলত। এভাবে মাস তিনেক চিকিৎসা নেওয়ার পর একদিন কৈতরি হাউস্যাকে জানাল সে মা হতে চলেছে, হউস্যার আঁটকুড়া খেতাব এইবার বুঝি ঘুচল। রীতিমতো উৎসব শুরু হলো হাউস্যার বাড়িতে। তিন-তিনটা গরু জবাই করে পুরো গ্রামের মানুষকে খাওয়ানো হলো। সে যেই-সেই খাওন নয়, একেবারে কবজি ডুবিয়ে ভূরিভোজ।

অবশেষে হাউস্যার একটি ছেলেসন্তান হলো। টকটকে ফরসা। ফরসা হোক কালো হোক, কুৎসিত কিংবা সুশ্রী, তাতে হাউস্যার কিছু আসে-যায় না। কৈতরি যে তাকে আঁটকুড়া খেতাব থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে, সেইটাই হাউস্যার সবচাইতে বড় প্রাপ্তি। এখন থেকে আর কেউ তাকে আঁটকুড়া হাউস্যা বলে ডাকবে না। এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে? ছেলের আকিকায়ও একইভাবে খাওয়ানো হলো। সেখানে প্রধান মেহমান ছিল আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর।

কৈতরির সন্তান হওয়ার পর সে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের দরবারে যাওয়া বন্ধ করল না, বন্ধ করল না তার খেদমত করা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে হাউস্যাকে আবার সুসংবাদ দিল। আবারও খুশি হলো হাউস্যা। তার অনেক সহায়-সম্পত্তি। বহু সন্তানে তার অসুবিধা কী? সন্তানই তো সম্পদ। গ্রামের মানুষজন আঁটকুড়া বলে পরিচিত হাউস্যার সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা দেখে রীতিমতো বিস্মিত! তারা বলতে লাগল, সবই তার ইচ্ছা। তার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়ে না। সাত বছরের মাথায় হাউস্যা চার ছেলে আর এক মেয়ের গর্বিত পিতা হলো। এতে হাউস্যা মহা খুশি। তিন ছেলেকে সে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের হেফজখানায় পবিত্র কোরআনের হাফেজ বানাতে দিয়েছে। ইচ্ছা আছে এই ছেলেদের সে অনেক বড় আলেম বানাবে, তার বাড়ির সামনে মসজিদ হবে, মাদরাসা হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ করতে দিল না দুষ্ট জিন। একদিন বিলের মধ্যে উল্টো করে পোঁতা অবস্থায় পাওয়া গেল হাউস্যাকে। আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলে দিল, এ কাজ দুষ্ট জিনের। কৈতরি আছড়ে পড়ে কাঁদল কিছুদিন। কথিত আছে, কৈতরির কান্না দেখে বনের পক্ষীও কেঁদেছে। তার দুঃখ প্রকাশ দেখে অনেকে বলাবলি করেছে, স্বামীর জন্য এত দরদ, এত ভালোবাসা তারা আগে কখনো দেখেনি। কাউকে দেখেনি এত শোকাহত হতে।

হাউস্যাকে মারার মাস দুই পর সেই দুষ্ট জিন এসে হানা দিল হাউস্যার বাড়িতেও। ছোট ছোট দুটি সন্তান নিয়ে কৈতরি বাড়িতে থাকে। বড় তিনটি ছেলে থাকে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের মাদরাসায়। তাদের কোনো সমস্যা হয় না। সমস্যা যত সব হাউস্যার বাড়িতে। জিনের উপদ্রব যখন মাত্রা ছাড়াল, তখন সেই জিন তাড়াতে মৃত হাউস্যার বাড়িতে এল আল্লামা আহমদকাফি হুজুর। সারাদিন নানা রকম চেষ্টা করা হলো জিন তাড়ানোর। কিন্তু রাতেই আবার দুষ্ট জিন চড়াও হলো হাউস্যার বাড়িতে। পরদিন আবারও সারা দিন ধরে আল্লামা আহমদ কাফি জিন তাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল। যখন ভয়ংকর বদ জিনের সঙ্গে পেরে উঠল না, তখন সে কৈতরিকে প্রস্তাব দিল, সে চাইলে তার সন্তানদের নিয়ে আল্লামা কাফির খেলাফতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা আহমদ কাফির খেলাফতের অন্দরে এসে কৈতরি কাফি হুজুরের চার বিবি, দাসী, খাদেম, জৌলুশ ইত্যাদি দেখে সে চমকে গেল। সব শেষের দুই সন্তান বাদে বাকি সব কটি মাদরাসায় পড়ে, সেখানে থাকে, সেখানে খায়। তাদের অন্দরমহলে যাওয়া নিষেধ। মায়ের সঙ্গে তাদের কথা হয় সপ্তাহে একবার, দরজার ফাঁক দিয়ে।

কিন্তু মাদরাসায় মোটেই মন টিকত না তার। এক বিজাতীয় কঠোর কঠিন ভাষা পড়তে গিয়ে তার জিব বের হয়ে যেত। আর যা-ই হোক, সে এটা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পরত যে তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার প্রতি সবার আচরণে এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। পড়া তার মনে ধরে না। নুরানি শেষ করতে করতেই তার বছর লেগে গেল। মাদরাসায় সে প্রচুর মার খেত। এই মার খাওয়ার কারণে তাকে মাদরাসায় সবাই ডাকত বিলাই ছ্যাঁচা বলে। বিলাই ছ্যাঁচা মানে হলো, বিলাই যেমন প্রচুর মার খেতে পারে, সে-ও তেমন প্রচুর মার খেতে পারত কিন্তু তার কিছুই হতো না। তার অবশ্য মার খাওয়ার হাজারও কারণ ছিল। তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল সে মাসের ত্রিশ দিন বিছানা ভেজাত। আর এই বিছানা ভেজানোয় সবচেয়ে বড় সুযোগটা নিত পাশের বিছানার বয়সে বড় ছাত্র ভাই আবু আনাস। প্রথম দিন সে যখন বিছানা ভিজিয়েছিল, এই আবু আনাসই চিৎকার করে সবাইকে বলেছিল। আর হুজুরেরাও অনেক মেরেছিল তাকে। এমন মার মেরেছিল যে তার শরীরে জ্বর এসে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিছানা ভেজানো থামেনি। প্রতিদিন বিছানা ভিজিয়েই যাচ্ছিল আর প্রতিদিন মার খেয়েই যাচ্ছিল। একদিন সেই আবু আনাস তাকে বলল, আমি তোরে এই মাইরের হাত থাইকা বাঁচাইতে পারি।

– ক্যামনে?

অপমান আর শাস্তির হাত থেকে মুক্তির আশায় একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে সে আবু আনাসের হাত চেপে ধরে বলল, দযদি পারেন, তাইলে আপনের গোলাম হইয়া থাকমু, যা কইবেন, তা-ই করুম'। এরপর আবু আনাস তাকে বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করল, 'তুই কি বিছানায় প্রস্রাব করার সময় স্বপ্নে দেখোস? মানে এমন কিছু দেখোস যে তোর অনেক মুতায় ধরছে আর তুই মুততে বইছোস কোনোহানে, কিন্তু দেখলি বিছানায় মুইত্তা দিছোস'।

– হ হ হ, তুমি ক্যামনে বুঝলা?

– বুঝি বুঝি, এই রোগের তো আমি চিহিৎসা করছি অনেক। তুই বুঝবি না। আমি ঠিক কইরা দিতাছি। কিন্তু কথা হইলো আমি যা চামু, দিতে হইব, পারবি?
– তুমি যা চাইবা, আনাস ভাই, তাই দিমু, খোদার কসম!
সেই রাতে ও যখন স্বপ্ন দেখল ও খড়ের গাদার সামনে প্রস্রাব করতে বসেছে, ঠিক তখনই আনাসের ধাক্কায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল। কোথায় খড়ের গাদা? চারদিক সুনসান নীরব। জানালা দিয়ে মৃদু চাঁদের আলো এসে পড়ছে। আনাস ওকে ফিসফিস করে বলল, 'ল, বাইরে ল'। ও কিছু না বলে আনাসের সঙ্গে বাইরে গেল। বাইরে যাওয়ার পর আনাস বলল, 'এহন এইহানে মুইত্তা দে'। ও তা-ই করল। রাত কয়টা বাজে বুঝতে পারছে না ও। চারদিক সুনসান নীরব। কয়েকটি ঝিঁঝি পোকা ডাকছে শুধু। একটু ভয় পেয়ে মনে মনে লা হাওলা পড়ে বুকে ফুঁ দিল। আনাসও প্রস্রাব করল। তারপর এসে দুজনেরই ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে প্রথম ও বিছানা ভেজানোর অপরাধে মার খেল না। কিন্তু রাতের কথা কিছুই মনে করতে পারল না। এ ঘটনায় ও যেমন বিস্মিত হলো, তেমন আনন্দিত। আসরের কিছু পর বাতি দেওয়ার কিছু আগে পুকুরপাড়ে মাছ পাহারা দেওয়ার ঘরে ওকে ডেকে নিয়ে আনাস বলল, 'কী রে? দেখছোস আইজ আর বিছানা ভিজাইস নাই। এইবার আমি যা চামু, দিতে পারবি?'
– হ, কও কী চাও, আনাস ভাই।
– তাইলে একটু পাইজামাডা খোল।
কিছু বুঝতে পারল না। তবে বেশ লজ্জা পেল। কিন্তু এক নিষিদ্ধ আনন্দের টানে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে পাজামা না খুলেও পারল না। এই পাজামা খোলার গল্প সে একেবারেই জানে না, তা-ও না। পাজামা খোলার পর যা করার আনাসই করল, ও শুধু দাঁত-মুখ খিঁচে পড়ে থাকল উপুড় হয়ে। বেশ কষ্ট হয়েছে, চোখে পানি চলে এসেছে। তবে খুব একটা খারাপ লাগেনি। পরদিন তারা নিজেরা নিজেদের বিছানার অবস্থান পাল্টে ফেলল। এরপর থেকে আনাস ওকে এভাবে ডেকে তুলত আর সময়-সুযোগ পেলে মাছ পাহারা দেওয়ার ঘরে, গোসলখানাসহ নানা জায়গায় তারা পাজামা খোলাখুলি করত। যেদিন ও খুলতে চাইত না, তার পরদিন বিছানা ভেজাত আর মার খেত, সবাই হাসত। এরপর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, আর না করবে না। এখন ওর আগের মতো কষ্ট হয় না। বরং একটু একটু ভালো লাগতে শুরু করেছে।
সবই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু ঝামেলা হলো হাদিসখানার আফগানি হুজুর যেদিন ওদের দুজনকে মাছ পাহারা দেওয়ার ঘরে পাজামা খোলা অবস্থায় দেখে ফেলল। দেখে কিছুই বলল না, শুধু বলল, ও যেন সন্ধ্যার পর তার ঘরে যায়। আফগানি হুজুরকে সবাই ভীষণ ভয় পায়। তার আসল নাম মুফতি মো. জালাল উদ্দিন মাওলানা। কিন্তু সে আফগানিস্তানে রাশিয়ার নাসারাগো বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে বলে সবাই তাকে আফগানি হুজুর ডাকে। কোথায় রাশিয়া আর কোথায় আফগানিস্তান, তা ওরা কিছুই জানে না। শুধু এতটুকু জানে, রাশিয়ার নাসারারা মুসলিম উম্মাহর বিশাল শত্রু। তাদের কতল করে আল্লাহ্‌র জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই ওদের ইমানি দায়িত্ব। আর সে বিষয়ে ওদের ওস্তাদরা প্রায়ই ওয়াজ করত।

এই আফগানি হুজুর সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার এক সাচ্চা জিহাদি। নিজ হাতে গুলি করে অনেক সোভিয়েত সেনা মারার মুখরোচক গল্পে যখন আফগানি হুজুর মেতে উঠত, তখন তার গালের দুই পাশ বেয়ে পানের রস কাঁচা-পাকা দাড়িতে পড়ত। আবার যখন রেগে গিয়ে জানোয়ারে মতো হাঁক দিত, তখন তার বিশাল ভুঁড়ি নড়ে উঠত। তা দেখে ছাত্ররা মুখ টিপে হাসত। সেই হাসি সে দেখে ফেললে ছাত্রদের কপালে নেমে আসত হাবিয়া দোজখের আজাব। কিন্তু ছাত্ররা নিজেরা বলাবলি করত, 'এত্তোবড় প্যাট লইয়া হুজুর ক্যামনে যুদ্ধ করছে?' তার মারের গল্প মাদরাসার সবার মুখে মুখে। প্রচলিত আছে, আফগানি হুজুর টান দিয়ে ছাত্রের কল্লা ছিঁড়ে ফেলে। পুরোনো ছাত্ররা মাদরাসায় এলে তারাও আফগানি হুজুরের ভয়ংকর মারের গল্প করত। সেই আফগানি হুজুর এই অবস্থায় ওকে দেখে ফেলেছে। আজ তাকে খুনও করে ফেলতে পারে। ভয়ে রাতে পেট ভরে খেতেও পারল না। নাকে-মুখে গোটাচারেক ভাত গুঁজে চলে গেল হুজুরের ঘরে। হুজুর তার সামনে বেশ মোটা আর চওড়া একটা কিতাব নিয়ে সুর করে পড়ছিল। সালাম দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়াল। হুজুর সালামের জবাব দিয়ে হারিকেনটা তুলে বলল, 'কেডা?' ও কোনোভাবে নিজের নাম বলল। 'ভিত্রে আয়' বলে সামনের কিতাবখানা বন্ধ করল। 'ভিত্রে আয় লুতি কওম, ভিত্রে আয়'। ওর বুকটা ধক করে উঠল। আজ হয়তো হুজুর ওকে মেরেই ফেলবে, এটা ও মনে মনে বারবার ভাবছে। ধীরপায়ে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। হারিকেনের আলোয় দেখল হুজুরের চোখদুটো কেমন চকচক করছে। আফগানি হুজুর খাটের ওপর দাঁড়িয়ে তার গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে দড়িতে রাখল। আতরের গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে। 'দরজাডায় খিল লাগায়া এদিকে আয়।' এবার ও আরও ভয় পেল। মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দরজায় খিল লাগিয়ে ও হুজুরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় হুজুর বলল, 'কী রে, অত ভয় পাইতাছোস ক্যান? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? আকাম করনের সময় মনে আছিল না?' একথা শুনে মনে মনে আল্লাহ্‌রে ডাকল আর ঢোঁক গিলল একটা। 'উপ্রে আয়।' বলে ওকে খাটের ওপর ডাকল। খাটের ওপরে ওঠার সময় দেখল এই খাটখানা একসময় ওদের বাড়িতে মেহমানখানায় ছিল। ওর মা এসে আল্লামা কাফি হুজুরের এখানে আশ্রয় নেওয়ার পর ধীরে ধীরে অনেক কিছুই চলে এসেছে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের দরবারে। এর আগে যখন ও আফগানি ওস্তাদের খেদমতে এসেছিল, তখন এখানে ছিল সাধারণ একা চৌকি। 'এহন থাইক্কা আমারে একটু বেশি কইরা তুই খেদমত করিস। হইছোস তো রাঙা মিষ্টি কুমড়ার মতো গোলগাল।' বিচার করতে এসে আফগানি হুজুর কেন এমন কথা বলছে, মাথায় ঢুকছে না ওর। তবে একটু সাহস হলো। মাথা নিচু করে ও জবাব দিল, 'জি হুজুর, আমারে মাফ কইরা দেন, আমার ভুল হইছে। আনাস ভাই আমারে জোর কইরা মাছ পাহারা দেওয়ার ঘরে লইয়া গেছিল'। একথার কোনো জবাব না দিয়ে আফগানি ওস্তাদ বলল, 'এহোন আয়, আমার পিঠটা একটু মালিশ কইরা দে'। শুধু ও না, মাদরাসার সব ছাত্রই এমন মালিশ করে অভ্যস্ত। সে নিবিষ্ট মনে ওস্তাদের পিঠ মালিশ করতে করতে ভাবল, হুজুর মনে হয় তাকে মাফ করে দিয়েছে। হুজুরের গায়ে অনেক বড় বড় পশম। সারা শরীর মোবারক থেকে পবিত্র আতরের গন্ধ আসছে। অনেক সময় পিঠ মালিশ করার পর হুজুর নিজের হাত দিয়ে ওর হাত তার দুই

পায়ের মাঝখানে নিয়ে বলল, 'নে, এহন এইডা ভালা কইরা মালিশ কর'। ও হুজুরের 'ওইটা' দেখে চমকে গেল। এত বড় আর দেখেনি। নিজেরটা হাতের আঙুলের মতো আর আনাসেরটা তার চেয়ে একটু বড়। আফগানি হুজুরেরটা শুধু বড় নয়, বিশাল! যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। শিহরিত হয়ে ও আফগানি হুজুরের 'ওইটা' মালিশ করতে শুরু করল। একসময় হুজুরের নিশ্বাস ঘন হয়ে এল। তার পাহাড়সম ভুঁড়ি তালে তালে ওঠানামা করতে শুরু করল। হুজুর প্রায় হাঁপিয়ে বলল, 'পাইজামা খোল!' ওর মনে আছে, ওর পায়খানার রাস্তা নিয়ে খুব বিশাল মোটা কিছু একটা ঢুকেছিল। ও যখন প্রচণ্ড চিৎকার করার চেষ্টা করছিল, তখন হুজুর সজোরে ওর মুখ চেপে ধরেছিল। তারপর আর ওর কিছু মনে নেই। ফজরের দিকে ও নিজেকে নিজের বিছানায় আবিষ্কার করল। ফজরের নামাজের পর ওকে আনাস দেখে মুচকি হেসেছিল। দেখে রাগে গা জ্বলছিল ওর। এস্তেনজায় গিয়ে অঝোরে কেঁদেছিল। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল রক্ত দেখে। দুই দিন বেশ চুপচাপ রইল। তেমন খাওয়াদাওয়াও করতে পারল না। মায়ের সঙ্গে দেখা করল। কৈতরি বেগম ওকে দেখে চমকে উঠেছিল।

– কী হইছে তোর?

– কিছু না।

কিন্তু মায়ের চোখ এড়ানো মুশকিল। সে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরকে বলে দুই দিন নিজের কাছে এনে রেখেছিল। এই দুই দিনে ব্যথা কমে গেল। কিন্তু মাকে কিছুই বলল না। মাদরাসায় ফিরে এল দুই দিন পর। অদ্ভুত বিষয় হলো, এরপর আনাস যখন ওর সঙ্গে 'ওই কাম' করল, তখন আর আগের মতো ব্যথা পায়নি। আর নিজেরও একটু একটু ভালো লাগছিল। এর কয়েকদিন পর আবার ডাক পড়ল আফগানি হুজুরের ঘরে তার খেদমতের জন্য।

◆ ১৫ ◆

কৈতরি তার বিশাল স্তনসমৃদ্ধ বুকের ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'এইভাবে আর কত দিন? আপনে কিন্তু কথা দিয়া কথার বরখেলাপ করতেছেন'। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর ঝাঁপিয়ে পড়ল কৈতরির ওপর। দুই হাতে কিল-ঘুষি-থাপ্পড় মারতে থাকল কৈতরির চোখে-মুখে-নাকে। শেষ রাতের সংগম শেষে হঠাৎ এমন আক্রমণে দিশেহারা হয়েগেল কৈতরি। বিশাল দেহের আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের মার খেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে গেলে কৈতরির মুখ চেপে ধরল। এরপর খাটের কোণে বসে হাঁপাতে লাগল। তারপর গজরাতে গজরাতে বলল, 'ওই খানকি মাগি, বেশ্যা মাগি, তুই আর কী চাস? তোরে থাকার জায়গা দিছি, তিন বেলা খাইতে পারতেছোস পোলা-মাইয়া লইয়া, তোর তিন পোলারে নিখরচায় পড়াইতেছি, আর কী চাইস রে ছেনাল মাগি?' আর সহ্য হলো না কৈতরির। এত দিন মুখ বুজে অনেক সহ্য করেছে। দেখতে দেখতে দুই বছর কেটে গেছে। এই দুই বছরে আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর হাউস্যার সহায়-সম্পত্তি সব দখল করে নিয়েছে। দিনের পর দিন সে কৈতরিকে ভোগ কর চলেছে। কথা ছিল মাস ছয়েক গেলে সে বিয়ে করবে কৈতরিকে। কিন্তু ছয়মাস যায়, বছর যায়, যেতে যেতে দুই বছর কেটে গেল। কিন্তু বিয়ে করার নাম নেই। উল্টো যা যা ছিল, সবই কৌশলে মাদরাসা, এতিমখানা আর মসজিদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। আছে শুধু বাড়ির জমিটুকু। তা-ও লিখে দেওয়ার জন্য কৈতরিকে চাপ দিচ্ছে। এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। মারের জবাবে এই প্রথমবার কৈতরি মুখ খুলল, 'আপনে একটা ভণ্ড! বিয়া না কইরা পরনারীর সঙ্গে সহবত করেন, আবার নিজেরে বলেন আল্লার খাস বান্দা'। একথা বলার পর আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল কৈতরির ওপর। কিছুটা প্রস্তুত ছিল কৈতরি। তাকে ছোঁয়ার আগে সে সরে গেল। খাটের কোনায় ধড়াম করে বাড়ি খেয়ে মাথা ফেটে গেল আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের। রক্ত কপাল বেয়ে চোখে যাওয়ায় চোখ জ্বালা করছে। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে সে কৈতরির গলা চেপে ধরল। জীবন বাঁচাতে কৈতরি প্রাণপণ লড়ে চলেছে। কিন্তু সাঁড়াশির মতো শক্তিশালী দুটি হাতের সঙ্গে পেরে উঠছে না কৈতরি। মনে মনে আল্লাকে ডাকছে সে। হঠাৎ কী মনে করে কৈতরিকে ছেড়ে দিল আল্লামা আহমদ কাফি হুজুর। কৈতরির ফরসা গলায় দাগ বসে গেছে। আল্লামা আহমদ কাফি হুজুরের ভয়ংকর নোংরা রূপ এর মধ্যেই দেখেছে কৈতরি। সে আল্লামা কাফি হুজুরের দুই পা জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্না শুরু করল। আহমদকাফি হুজুর খাটে বসে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। তার রক্ত থেমে গেছে। কৈতরির কান্নার দমক কিছুটা কমে এলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'কী না ছিল আমার? স্বামী, সংসার, সহায়-সম্পত্তি। শুধু ছিল না আমার কোলভরা সন্তান। তাই আমার স্বামী বিশ্বাস কইরা মাওলানার কাছে নিয়া আসছিল চিকিৎসার লাইগা। সেই বিশ্বাসের ঘরে আগুন দিয়া আমার প্যাডে হান্দাইলেন নিজের সন্তান। একটা-দুইডা না, পাঁচ-পাঁচটা। তহন কী

কইতেন? আমার ছোড বিবি, তোমারে আমি হাউস্যাখন তালাক লইয়া নিজের বিবি মর্যাদা দিমু। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি আমার স্বামীরে জিনে মারছে না কেডায় মারছে। তারে মারার পর কইলেন, আরে এহুনি তোমারে বিয়া করলে মাইনষে সন্দেহ করব। মাস ছয়েক যাউক। আইজ দুই বছর। এই দুই বছর ধইরা আপনে আমারে খালি ব্যবহার করছেন। আপনার কথায় আমি কার লগে শুই নাই? চেয়ারম্যান, পুলিশ, এমপি–কে বাদ গেছে? আমারে ভাড়া খাডাইয়া আপনে আপনের কাম হাসিল কইরা নিছেন। আমি কী পাইছি? আপনে কী মনে করেন? মাইনষে কিছু বোঝে না? সব বোঝে। আমি নামাজ পড়ি না বইলা আপনে আমারে অনেকদিন গরুর মতো পিডাইছেন। নামাজ না পড়লে আল্লায় দোজখের আগুনে পোড়াইব আর পরের বউরে বিয়া ছাড়া চুদলে আল্লায় তা দ্যাহে না? আমার সন্তানগুলো আপনার ঔরসে হইছে, তারা এহন এই বিশাল দরবারে কুত্তা-বিলাইর ছাওর মতো এতিম খেতাব লইয়া বড় হইতেছে। এর বিচার কেডায় করব? ইয়া আল্লা, তুমি কই বইয়া এইসব দেহো? তোমার হাতে কি কোনো গজব নাই?' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল কৈতরি। আল্লামা কাফি হুজুর খাট থেকে উঠে পিতলের জগ থেকে পানি নিয়ে কপালের রক্ত ধুয়ে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, 'ইসলামে দাসী সহবত হালাল। তুই আমার দাসী ছাড়া আর কিছুই না, মাগি'। এই কথা বলে হনহন করে বেরিয়ে গেল। কৈতরি দুই হাতে মুখ চেপে ধরে মড়াকান্নায় ভেঙে পড়ল।

এই ঘটনার দিন পনেরো পর জিনে কৈতরিকেও মেরে ফেলল। তার পাঁচ সন্তান পুরোপুরি এতিম খেতাব নিয়ে সত্যি সত্যি কুকুরের মতো বড় হতে থাকল আল্লামা কাফি হুজুরের দরবারে।

মাহফিলের আগের দিন মাদরাসায় সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছে। শুধু মাদরাসায়ই নয়, আশপাশের বাড়িগুলোতেও সাজসাজ রব পড়ে গেছে। বিদ্যুৎ অফিস থেকে ফ্রি লাইন নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে এশার নামাজের বেতর শেষ হওয়ার পর টগরের ডাক পড়ল জিন সম্রাট কবীর হুজুরের ঘরে। খুবই খুশি হলো টগর। ও মনে মনে অপেক্ষায় ছিল কখন কবীর হুজুর ওকে খেদমতের জন্য ডাকে। তার খেদমত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে টগর। জিন হুজুর বলেছে, টগরের হেফজ শেষ হলে আস্তে আস্তে ওকেও জিন নামানো শেখাবে সে। সে কথা ভাবতেই টগরের মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। হুজুরের রুমে গিয়ে দেখল, হুজুর সুর করে কোরআন শরিফ পড়ছে। তাই টগর সালাম দিল না। হুজুর একসময় ছদাকাল্লা হুল আজিম পড়ে বলে কোরআন শরিফ বন্ধ করে নিজেই টগরকে সালাম দিল। টগর উত্তর দিয়ে কাছে এগিয়ে গেল। হুজুর টগরকে অনেক কিছু খেতে দিয়ে বলল, 'আমার এক ছাত্র তোমার জন্য নিয়া আসছে'। কথাটা না বুঝে হুজুরের দিকে তাকিয়ে রইল টগর। এরপর জিন হুজুর ওরফে হাফেজ মাওলানা কবীর বলল, 'আমার তো অনেক ছাত্র আছে, যারা জিন। আমি তাদের পড়াই। তোমার কথা তাদের বলেছি। তারা এইসব খাবার কোহেকাফ থেকে নিয়া আসছে তোমার জন্য'। টগর খাবারগুলো শ্রদ্ধাভরে মজা করে খেল। টগরের খাওয়া শেষ হলে হুজুর ওকে ভালো করে অজু করে আসতে বলল। তারপর জিন হুজুর সুরা জিন পড়া শুরু করল। এরপর দুজন খাটের ওপর মুখোমুখি বসল। 'আমি এখন জিন নামাব। তুমি দেখবা। আস্তে আস্তে তুমিও শিখ্যা যাবা।' একথা শুনে একটা শিহরণ খেলে গেল টগরের মনে। টগর খাটের ওপর বসার পর হুজুর বেত দিয়ে লাইট অফ করে দিল। ঘরময় ছিটিয়ে দিল গোলাপজল। জিন হুজুরের খাটের উঁচু অংশের আড়ালে অত্যন্ত সুকৌশলে একটা দড়ি বাঁধা রয়েছে। সে দড়ি রয়েছে অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। সেই শাখা-প্রশাখাগুলোর মাথায় বাঁধা রয়েছে ইটের টুকরো, কাঠের টুকরো, রড ইত্যাদি। ওই রশির মাথা ধরে টান দিলে একসঙ্গে অনেক জায়গায় অনেকগুলো শব্দ হয়। বেশ কিছু সময় চুপচাপ সাধনা করার পর জিন হুজুর রশি ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা ভেঙে ঢনঢন-টনটন করে বেশ কয়েক জায়গায় শব্দ হলো। বেশ ভয় পেয়ে গেল টগর। জিন হুজুর জোরে জোরে সুরা-কালাম পড়তে লাগল। একটু পর থেমে বলল, 'আইজ মনে হয় তুমি খুব একটা পাক-পবিত্র ছিলানা। ঘরে কয়েকটা দুষ্ট জিন আইছে। তুমি ভয় পাইয়ো না। আমি তো আছিই। কুনো ভয় নাই'। কিন্তু হুজুরের ভরসায় কোনো কাজ হলো না। জিন হুজুরের আমন্ত্রণে কোহেকাফ থেকে আসা কোনো এক দুষ্ট জিন নিকষ অন্ধকার টগরের সঙ্গে খুব খারাপ কিছু একটা করল, যা খুবই লজ্জার, ব্যথার ও মনঃকষ্টের। চিৎকার করার চেষ্টা করতে গিয়েও পারল না টগর। দুষ্ট জিন তার মুখ চেপে ধরে রেখেছিল। জিন হুজুর কিছুই করতে পারল না। শুধু টগর রুম থেকে বের হওয়ার সময় বারবার বলে দিল,

এই কথা বাইরে কাউকে বললে টগরের বিশাল ক্ষতি হবে। ওর মুখ দিয়ে রক্তপড়া শুরু করবে, তারপর ও মারা যাবে। একথা শুনে টগর আরও ভড়কে গেল। জিন হুজুরকে নিশ্চিতকরল, ও একথা কাউকেই বলবে না। তবে জিন হুজুর ওকে কথা দিল, এর বিচার সে অবশ্যই করবে আর নিজ হাতে করবে। দরকার হলে ওই দুষ্ট জিনকে সে কেয়ামত পর্যন্ত বোতলবন্দী করে রাখবে।

◆ ১৭ ◆

মাহফিলের আগের দিন মাহমুদের জ্বর অনেকটাই কমে গেল। মাথাব্যথাও নেই। একটু আগে জিহাদি হুজুর ওর জ্বর দেখার ছলে ওর পায়খানার রাস্তায় আলতো করে একটা খোঁচা দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, নামাজ-রোজার গাফিলতির কারণে এইসব জ্বরজারি হয়। মাহমুদ এ কথার কোনো জবাব দেয়নি। জিহাদি হুজুর নানা ছলে ওকে ছয়-সাতবার ধর্ষণ করেছে। এই জিহাদি হুজুরকে একবার পুলিশে ধরেছিল। কারণ, সে বড় ছাত্র ভাইদের নিয়ে গভীর রাতে কী সব ট্রেনিং করায়। এই মাদরাসার সবাই জানে এই জিহাদি হুজুরের সঙ্গে আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়ার বড় বড় জিহাদির সম্পর্ক আছে। ক্লাসে অনেককে সেই সব ছবিও দেখিয়েছে। জিহাদি হুজুরের কথা হলো, মানুষের জীবনই হলো এই জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। অবশ্য সে কথা শুধু জিহাদি হুজুর একাই বলে না, সব হুজুরেরাই বলে। তবে জিহাদি হুজুর একটু বেশি বলে। আর সে কথা মাহমুদ বিশ্বাসও করে। জীবন দিয়ে কিংবা নিয়ে যেভাবে হোক, এই পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু মাহমুদের মাথায় ঢোকে না এত পাপ করেও তারা কীভাবে নিজেদের ভালো মানুষ দাবি করে? এই মাদরাসায় সে দেখেছে সব হুজুরেরাই লুতি কওম। তাতে কি তাদের পাপ হয় না? আর সব হুজুরেরাই বলে, যত ধরনের ব্যভিচার আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাপ জেনা করা। আর সেই সব জেনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাপ পুরুষে পুরুষে জেনা করা। এর শাস্তি খুবই ভয়ানক। এ বিষয়ে অনেক সহিহ্ হাদিস আছে। কিন্তু সেটা তো এই মাদরাসায়ই বেশি হয়। আর তা বেশি করে মাদরাসার শিক্ষকেরা। ছাত্ররাও করে। ছোট ছাত্রদের চেয়ে বড় ছাত্ররা আবার বেশি করে। এসব কেমন বিচার, বোঝে না মাহমুদ।

আজ রাতে সবারই শুতে দেরি হলো। কাল মাহফিল। যেই-সেই মাহফিল নয়, হেলিকপ্টার হুজুরের মাহফিল। মাহমুদের সবে চোখ বুজে এসেছে, এমন সময় জুয়েল এসে কানে কানে বলল, 'ছাদে ল'। মাহমুদ উঠে জুয়েলের পা ধরে হাউমাউ করে কান্না করে বলল, 'ভাই, আমার খুব ব্যথা করতেছে। গায়েও খুব জ্বর। আইজ আমারে মাফ করে দেন। কাইল অবশ্যই যামু, ভাই'। জুয়েল কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে গেল। কিন্তু মাহমুদ সারা রাত ঘুমাতে পারল না। কাল সে কিছু একটা করবে। আর সহ্য হয় না। এ জীবন আর ভালো লাগে না। যা হওয়ার তা-ই হবে।

জোহরের নামাজের পরপরই মাইক বেজে উঠল। বিভিন্ন জায়গায় মোট একশোর ওপরে মাইক লাগানো হয়েছে। প্রতিটি খাম্বার সঙ্গে দুটি করে। মাহফিলের কেন্দ্রস্থল থেকে আরও আধা কিলোমিটার দূর পর্যন্ত মাইক লাগানো হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যাদের কণ্ঠ ভালো, তাদের দিয়ে কেরাত, ইসলামি সংগীত গাওয়ানো হচ্ছে। এসবের শব্দে এলাকা প্রকম্পিত।

মাহফিলের ময়দানে ধীরে ধীরে লোকসমাগম শুরু হয়েছে। হাতে লাইট নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসা শুরু করেছে। মাগরিবের আজানের আগেই হেলিকপ্টার হুজুরের

হেলিকপ্টারে রাজসিক প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। এই মাঠেই নামবে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার হুজুর ইমাম হয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ানোর কথা আছে। এলাকার লোকজন তার পেছনে নামাজ পড়বে বলে এসেছে। মাদরাসার অপেক্ষাকৃত বয়সে বড় ছাত্ররা দায়িত্ব পেয়েছে স্বেচ্ছাসেবকের। তাদের হাতে বাঁশের লাঠি, মাথায় লাল কাপড় আর বুকে ঝুলছে ব্যাজ। তাতে ছবিসহ নাম লেখা, আর বড় বড় অক্ষরে লেখা স্বেচ্ছাসেবক। তাদের ভাবই আলাদা। আজ এখানে প্রধান বক্তা হেলিকপ্টার হুজুর। এ ছাড়া বড় বড় মাদরাসার মুহতামিমরাও বক্তব্য রাখবে। তার আগে এই মাদরাসার শিক্ষকেরা বক্তব্য রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ বক্তা হওয়ার বিষয়টি ঝালাই করে নিচ্ছে। আসরের কিছু পর বড় হুজুর, অর্থাৎ এই মাদরাসার মুহতামিম হুজুর ফোন করল হেলিকপ্টার হুজুরের সেক্রেটারির কাছে। কোথায় কতদূর কখন রওনা দেবে, এসব জানার জন্য। পাশাপাশি এ-ও জানাল, লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিয়ানে কেরাম অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার হুজুরের পেছনে নামাজ পড়বে বলে। কিন্তু এই কথার জবাবে সেক্রেটারি যা জানাল, তাতে মাথায় রক্ত উঠে গেল মুহতামিমের। হুজুর নাকি এশার নামাজের আগে রওনাই দিতে পারবে না। কারণ, সে এখন সিলেটে ওয়াজ করার জন্য হেলিকপ্টারে উঠবে। সেখানে কাঁটায় কাঁটায় দুই ঘণ্টা ওয়াজ করে তারপর এখানের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে উঠবে। এই কথা বলে মুহতামিমকে কোনো সুযোগ না দিয়েই ফোন কেটে দিল। তারপর শতবার ফোন করার পরও ওপাশ থেকে তা কেউ ধরল না। এখন অপেক্ষমাণ মুসল্লিদের কী বলবে মুহতামিম? অবশ্য সে সব কিছুতেই চমৎকার মিথ্যে বলে 'ম্যানেজ' করতে পারে। শুধু নওশাদ চৌধুরীকে ম্যানেজ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে। সে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার 'পানিপুনি'র বোতল খুলে বসেছে। কিছুক্ষণ পরপর ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। সময় যতই গড়াচ্ছে, উৎসাহিত জনতার পরিমাণ ততই বাড়ছে। এটা দেখেও বিশাল খুশি মুহতামিম। মাহফিলের একপর্যায়ে নির্মিতব্য মাদরাসা আর মসজিদের জন্য সাহায্য চাওয়া হবে। তখন হবে দানের প্রতিযোগিতা, কে কত দিতে পারে। এজন্য নিজস্ব লোক ঠিক করা আছে, যে বলবে, আমি এত লাখ। একবার লাখের ঘরে উঠলেই কেল্লা ফতে। তারপর তার দেখাদেখি অনেকেই লাখ টাকা দেবে। এই মসজিদ-মাদরাসার জন্য সাহায্য চাওয়ানো হবে হেলিকপ্টার হুজুরকে দিয়ে। এই বলার জন্য সে আলাদাভাবে পঞ্চাশ হাজার চেয়েছে। কারণ, সে নাকি দেখেছে, এর আগে যত মাহফিলে সে সাহায্য চেয়েছে, সেখানে কোটি টাকাও উঠেছে। মুহতামিম আর নওশাদ চৌধুরী হেলিকপ্টার হুজুরকে হেলিকপ্টার ভাড়া আর তার হাদিয়ার বাইরেও এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সানন্দে রাজি হয়েছে।

ধীরে ধীরে হেলিকপ্টারের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে মানুষ। মাগরিবের কিছু আগে মুহতামিন মাইকে ঘোষণা দিল, 'প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা, একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাদের জানা দরকার। আমাদের মহামান্য প্রধান বক্তা যখন এখানে আসার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে উঠেছেন, তখন হেলিকপ্টারে সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে। জানি না আল্লাহ্ পাক আমাদের কোন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। এখন হেলিকপ্টার মেরামতের কাজ চলছে। যখনই ঠিক হবে, তখনই রওনা দেবে। উনি একটু আগে আমাকে ফোন করে বিষয়টির জন্য দুঃখ প্রকাশ

করেছেন। আপনাদের সবাইকে বলেছেন ওনার জন্য দোয়া-খায়ের করতে'। বলেই মুহতামিম মুনাজাতের জন্য আল্লাপাকের দরবারে হাত তুলল। সেই মোনাজাত দীর্ঘ হলো মাগরিবের আজান পর্যন্ত। মোনাজাতে আল্লার দরবারে কান্নাকাটিও করল বেশ কিছুক্ষণ।
মাগরিবের নামাজের পর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল মাদরাসার মাঠ। আশপাশে কোনো মোটরসাইকেল চলার শব্দ পেলেও কেউ কেউ 'হেলিকেপ্টার হেলিকেপ্টার' বলে চিৎকার দিয়ে উঠছে। কিন্তু সত্যিকারের হেলিকপ্টার যেন আর আসতেই চাইছে না। মুহতামিম একের পর এক ফোন করেই যাচ্ছে হেলিকপ্টার হুজুরের সেক্রেটারিকে। কিন্তু ফোন আর রিসিভ হচ্ছে না। নওশাদ চৌধুরী একের পর এক গালি দিয়ে যাচ্ছে ফোনে। এটা তার মান-সম্মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। হেলিকপ্টার হুজুর এসে না পৌঁছালেও খুচরা বক্তারা মাঠ বেশ গরম করে রেখেছে। জিহাদ কতটা দরকার, বেপর্দা নারীর কারণে সমাজের কী কী ক্ষতি হচ্ছে, পর্দা না থাকায় কী পরিমাণ ধর্ষণ বেড়েছে, ইহুদি-নাসারারা প্রতিদিন ষড়যন্ত্র করে ইসলামের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে, এসবই সেই জ্বালাময়ী বক্তব্যের বিষয়। বক্তব্যে এক পর্যায়ে সবাই জিহাদির কাছে ওয়াদা করল, তারা আর কেউই কখনো মালাউনদের সংস্কৃতি পয়লা বৈশাখ পালন করবে না। কারণ, হুজুর বলেছে, যে বা যারা পয়লা বৈশাখ পালন করবে, তার হাশর হবে হিন্দুদের সঙ্গে। এর মানে নিশ্চিত দোজখ। জিহাদি হুজুর ওঠার পর মনে হলো মাঠে আগুন লেগেছে। আলোচনার অন্যতম বড় বিষয় নাস্তিকতা ও সমকামিতা।
'ওই যে দেখেন্না শাহাবাগি, চির জাহান্নামি! কতগুলো বেশ্যা মাগি নাইচ্চা নাইচ্চা আল্লাহ্‌র পেয়ারের বান্দাগো মিথ্যা মামলায় ফাঁসি চাইছে! ওইগুলো কী? ওইগুলা হইল নাস্তেক! ওইগুলা কী?' সবাই সমস্বরে জবাব দিল, 'নাস্তেক!'
'ওইগুলা সমকামী, ওইগুলা কী?' সবাই আবার সমস্বরে আবার জবাব দিল, 'সমকামী!'
'সমকামী কী, বুচ্ছেন? বোঝেন্নাই! যুবক ভাইরা হয়তো ফেইসবুকের কল্যাণে কিছুটা বুচ্ছে, মুরব্বিরা বোঝেনাই...' এবার মাঠে একটু গুঞ্জন উঠল।
'সমকামী কী, খুইল্লা কইতামনি?'
মাহফিলের সামনে বসে থাকা কয়েকজন বলে উঠল, 'কন হুজুর, কন'।
'না থাক! অমন কথা মুখে আনলে আমার বমি আহে! তারপরও বলি, কারণ, আমাদের জানার দরকার আছে। সমকামী হইলো পুরুষে পুরুষে জেনা করা! বলেন নাউজুবিল্লাহ!'
মাঠে নাউজুবিল্লাহ বলার পরও একটা গুঞ্জন উঠল। কারণ, ইদানীং এই ঘটনা মাদরাসার শিক্ষকেরা এত বেশি ঘটাচ্ছে যে যারা পত্রিকা পড়ে না, তাদের কানেও ঘটনা যাচ্ছে। আর এই জিহাদি হুজুরের নামে যে এমন কথা প্রচলিত, তা স্থানীয় অনেকেই জানে। এই জিহাদি আগে যে মাদরাসায় ছিল, সেখান থেকে এই দোষেই তার চাকরি গেছে, সেটাও কমবেশি অনেকেই জানে, তাই এই গুঞ্জন। জিহাদি হুজুর গলাখাঁকারি দিয়ে গুঞ্জন থামিয়ে দিয়ে বলা শুরু করল, 'প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা আমার! এই সকল নয়ানাস্তেক মুরতাদদের কতল করতে হবে। যে নাস্তেক হবে, তারই কল্লা ফেলে দিতে হবে, যে নাস্তেক হবে, তারই কল্লা ফেলে দিতে হবে। বলেন ঠিক্কিনা!'
'ঠিক!'

'আপনারা জানেন, এই সমকামিতা মহান আল্লাপাক রাব্বুল আলামিন নিতে কতটা অপছন্দ করতেন? লুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো কওম ধ্বংস করে দিলেন এই সমকামিতার অপরাধে। তারা সবাই এই জঘন্য কর্মে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্ তার গজব মোবারক ফেলে পুরা জাতি ধ্বংস কইরা দিলেন। সেখানে আমি-আপনি এই সমকামিতা মেনে নিতে পারি?'
'না!'
'আজ এইখানে এক্ষুনি সবাই এই নোংরা কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন! এইসকল নাস্তেক, মুরতাদ, সমকামীদের এই সমাজে কোথাও স্থান হবে না। একেকটাকে ধরে ধরে জবাই করে জাহান্নামে পাঠাইয়া দেবেন। আর নাহলে আল্লাহ্‌র জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। বলেন আমরা এদের কল্লা ফালাইয়া আল্লাহ্‌র জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করব কিনা!'
পুরো মাঠ গরম হয়ে গেল। স্টেজে একজন চিৎকার করে বলল, 'নারায়ে তাকবির।' উত্তেজিত জনতা বলল, 'আল্লাহুয়াকবর!' কয়েকবার স্লোগান দেওয়ার পর যখন থামল, তখন সে ওয়াজ শুরু করল নারীর পর্দা নিয়ে।
এখানে ওয়াজ এই প্রথম নয়। বারো বছর ধরে এখানে সফলতার সঙ্গে ওয়াজ হয়ে আসছে। তবে হেলিকপ্টার হুজুরের মতো হাই প্রোফাইল বক্তা এই প্রথম। কিন্তু এত বড় নামীদামি বক্তা যে এত ধুরন্ধর আর বাটপার হবে, তা কোনোভাবেই বুঝতে পারেনি মুহতামিম। মাগরিব পার হয়েছে, এশা হবে একটু পর। কী করবে বুঝতে পারছে না মুহতামিম। খুব ঠাণ্ডা মাথায় সে স্টেজে বসে আছে। হেলিকপ্টার হুজুর যদি না আসে তো কী করবে সে? নাহ্! এমন কথা ভাবতেই পারছে না মুহতামিম। সামনের লাখ লাখ না হোক, অন্তত কয়েক হাজার মুসল্লি রয়েছে, যারা এই ওয়াজের জন্য টাকাপয়সা, ধান-চাল, গরু-ছাগল, সুপারি, হাঁস-মুরগি অনেক কিছু দিয়েছে। এবছর তহবিল সংগ্রহও হয়েছে মাশাল্লা। এখনো মাহফিল থেকে মাদরাসা আর মসজিদের কথা বলে টাকা ওঠানো বাকি। এই মাহফিল মাদরাসায় আয়োজিত সর্ববৃহৎ মাহফিল। ভাগ্য ভালো থাকলে শুধু মাহফিল থেকেই প্রধান বক্তার কথায় বিশ-পঁচিশ লাখ টাকাও উঠে যেতে পারে। কিন্তু সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে যদি হেলিকপ্টার হুজুর সত্যিই না আসে। এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ হুজুরের সেক্রেটারি ফোন দিল। দ্রুত সে ফোন নিয়ে স্টেজের বাইরে চলে গেল। এক কানে আঙুল দিয়ে শুনল ওপাশ থেকে বলছে, 'আমরা রওনা দিয়েছি। আর বিশ-পঁচিশ মিনিট লাগবে'। বলেই ফোন কেটে দিল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো অবস্থা হলো মুহতামিমের। দৌড়ে গিয়ে স্টেজের একটা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলল, 'উপস্থিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, মহান আল্লাপাকের অশেষ রহমতে আমাদের প্রধান বক্তার হেলিকেপ্টার ভালো হয়েছে, ওনারা রওনা দিয়েছেন, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ!' এতটুকু বলেই মুহতামিম স্টেজ ত্যাগ করল। স্টেজের পেছনে দাঁড়ানো তার দুই খাদেমের মধ্যে ফাহিমকে বলল, 'আমার রুমে আয়, জলদি'। খুশিতে মনটা যেন ফড়িঙের মতো নাচানাচি করছে মুহতামিমের। সে ধরেই নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টার হুজুর আসবে না। যদি না-ই আসত তাহলে কমিটির কাছে কী জবাব দিত? কী বলত এই উপস্থিত হাজার হাজার মুসল্লিকে? এই কদিন ধরে লাখ লাখ টাকা তুলেছে ছাত্ররা। এখন মুহতামিম মাহফিল চলাকালে কালেকশন নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী। নির্মিতব্য মাদরাসা

ভবন ও মসজিদের কথা বলে ভালো টাকাই উঠবে যদি হেলিকপ্টার হুজুর বলে দেয়। বলে সে দেবে নিশ্চয়ই। যেহেতু এই বলার জন্যই সে আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। সেখানে কেউ নির্মাণ খরচ দেবে, কেউ বস্তায় বস্তায় সিমেন্ট, টনকে টন রড, বালি ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। তবে বিষয়টা যেহেতু মসজিদ-মাদরাসার আর এর পেছনে রয়েছে নওশাদ চৌধুরীর মতো এক সাবেক সুদের কারবারি ধুরন্ধর ব্যক্তি, তখন না দিয়েও আর উপায় থাকবে না। এই সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যেত যদি হেলিকপ্টার হুজুর না আসত। মুহতামিমের মনে হচ্ছে, তার ফাঁসির রায় বাতিল হয়েছে। এই খুশিতে মুহতামিম একটু বাড়তি আনন্দ করতে চায়। তাই তার 'ইশপিশাল' খাদেম ফাহিমকে রুমে ডেকেছে। তাকে এই বিশেষ সেবাদানের জন্য ফাহিম ছাড়াও আরও জনা ছয়েক ফুটফুটে শিশু রয়েছে। তারা একেকদিন একেকজন তার সঙ্গে নিদ্রা যায়। অর্থাৎ বলার সঙ্গেসঙ্গে পাজামা খুলে শুয়ে পড়ে।

মাদরাসায় পড়াকালে সে যখন দিনের পর দিন ধর্ষণের শিকার হতো, তখন সে স্বপ্ন দেখত একদিন যেভাবেই হোক, সে মাদরাসার শিক্ষক হবে। হবে বড় হুজুর বা মুহতামিম। তারপর প্রতিশোধ নেবে। এমন ভাবনা অনেকেরই ছাত্রাবস্থায় তৈরি হয়। সেটা সে-ও জানে। এখন যারা ধর্ষিত হচ্ছে, তারাও হয়ে উঠছে একেকজন শিশু ধর্ষক। এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মাদরাসায় পড়াকালে ওকেই বলেছে ওর অনেক সহপাঠী। তাদের বক্তব্য হলো, আমি মারা খাইছি, আমি না মাইরা ছাড়ি কীভাবে? অনেকে আবার মাদরাসায় থাকাকালে যখন বড় হয়, তখন মাদরাসার ছোট ছাত্রদের ধর্ষণ করে প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করে। যেমন ছিল আনাস। আনাস তার সঙ্গে প্রথম যেদিন এই কাজ করে, সেটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মাছ পাহারা দেওয়ার টংঘরে আফগানি হুজুরের সামনে আচমকা পড়ে গিয়েছিল, তা মোটেই নয়। ওটা ছিল আসলে আনাস আর আফগানি হুজুরের পরিকল্পনার অংশ। যেটা আনাস ওকে নিজেই বলেছে। আনাসকে মাদরাসার প্রায় শিক্ষকই নিয়মিত ধর্ষণ করত। ওকে আফগানি হুজুরের হাতে তুলে দেওয়া ছিল সেই প্রতিশোধেরই একটা অংশ। কিন্তু ও যত বড় হতে থাকে, তত ওর দুটোই ভালো লাগা শুরু করে। অর্থাৎ মারতেও ভালো লাগে, মারা খেতেও ভালো লাগে। তবে এখানে ওকে মারবে, এমন লোক পাওয়া যায় না। ওকে মেরেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। তবে হ্যাঁ, পেয়েছিল একজন। বদিউজ্জামান নামের ১৪-১৫ বছরের এক ছাত্র। যেছিল ওর মতোই অর্থাৎ নিজেও খেতে ভালোবাসত আবার মারতেও খুব পছন্দ করত। আহা, সেই সব দিন! এখনো বদিউজ্জামানের কথা প্রতি রাতে মনে পড়ে মুহতামিমের। কী একটা সময় ছিল মুহতামিম আর বদির! একজন অন্যজনকে স্বামী-স্ত্রী মনে করত। ছেলেটা খুব আবেগপ্রবণ ছিল। আবেগের বশবর্তী হয়ে এক ভয়ংকর অপরাধ করে পালিয়ে গেল এই মাদরাসা থেকে। তখনো মুহতামিম কাউকে কিছু না বললেও ওর বুকটা ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল।

মুহতামিম যখন আল্লামা কাফি আহমদ হুজুরের মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করল, তখন তার বয়স তেইশ। চাকরি হলো পাশের থানার একটা মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে। ততদিন সে নিয়মিত ছাত্র ধর্ষণ শুরু করেছে। তার সামনে শত শত গেলমান। চাইলেই

তাদের পাচ্ছে নিজের খেদমতকারী হিসেবে। কিন্তু একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। লোভ সামলাতে না পেরে মাদরাসা কমিটির এক ছেলেকে ধর্ষণ করে বসল। আর সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। তখন এসব নিয়ে পুলিশে দেওয়ার চল ছিল না। জনতা ধরে মেরেছিল খুব। আজও অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সেই মারের ব্যথা টের পায়। জুতার মালা পরিয়ে মুখে চুনকালি মেখে বের করে দিয়েছিল এলাকা থেকে। এরপর নদীভাঙার গল্প ফেঁদে বেরিয়ে পড়ে সে। এসে পড়ে এই সুদি নশু ওরফে নওশাদ চৌধুরীর হাতে। তারপর থেকে আছে, চলছে।

মুহতামিম সাহেব রুমে এসে ফাহিমের বিশেষ খেদমত নেওয়া শুরু করল। খেদমত গ্রহণ যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখন ধাম ধাম করে কেউ একজন লাথি মারতে শুরু করল তার ঘরের দরজায়। মুহতামিম বিচলিত না হয়ে ধীরেসুস্থে সেবা গ্রহণের কাজ শেষ করে পাজামা পরে নিয়ে ফাহিমকে পাঠিয়ে দিল বাথরুমে। মুহতামিম জানে কে তার দরজায় লাথি মারছে। এই এলাকায় তথা এই ইউনিয়নে এমনকি গোটা থানায় কারো সাহস নেই মুহতামিমের দরজায় লাথি মারে। শুধু একজনই এই সাহস ও ক্ষমতা রাখে। আর সে হলো মাদরাসা কমিটির আজীবন সভাপতি সুদি নশু ওরফে নওশাদ চৌধুরী। কিন্তু তাও সব সময় করে না সে। যখন ওই 'পানিপুনি' খায়, তখন তার মাথায় মাল উঠে যায়, আর এমন করে। দরজা খোলার পর নওশাদ চৌধুরী বলল, 'ওই মিয়া, তুমি রুমে হুইয়া পোলা লাগাও, অ্যা? প্রধান বক্তার খবর কি, অ্যা?' মুহতামিম মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করেন। পোলা আপনেও লাগাইবেন, সমস্যা কি? বক্তা লইয়া চিন্তা কইরেন না। সে হেলিকপ্টারে উঠছে'।

'আরে খানকির পোলা, তোর হেলিকেপ্টারের গুষ্টি চুদি, তোর গুষ্টিও চুদি। আমার বক্তা কই? হেলিকেপ্টার কই? সন্ধ্যা থাইক্যা হুনতাসি আইতাছে আইতাছে। ট্যাকা কি বলদের পোন্দে দিয়া পড়ে? খানকির পোলা, কহন আইবো?' মুহতামিম নওশাদ চৌধুরীকে নিয়ে খাটে বসাল। তারপর বলল, 'আপনে মাথা ঠাণ্ডা কইরা বহেন। উনি আইতে আর মিনিট বিশেক সময় লাগবে। আপনে ততক্ষণ রেস্ট করেন, ছাত্র একটা আছে, তার খেদমত গ্রহণ করেন। পরে গোসল-টোসল কইরা আতরটাতর দিয়া স্টেজে আহেন, হেলিকেপ্টার হুজুরের একপাশে আপনে বইবেন, এক পাশে আমি'।

একথা শোনার পর নওশাদ চৌধুরী খানিকটা ঠাণ্ডা হলো। বাজখাঁই গলায় বলল, 'কৈ, ছাত্র কৈ?' নশুর হুঙ্কার শুনে ফাহিমের বুকটা ধক করে উঠল।

অবশেষে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে রাত নয়টার কিছু পর হেলিকপ্টার এসে নামল। হুজুর এসে নামার পর তার নামের আগে-পরে নানা বিশেষণ লাগিয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু হলো। পুরো এলাকা প্রকম্পিত হলো স্লোগানে। আন্দোলিত হলো পুরো এলাকা। বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে ছুটতে দেখা গেল ক্যামেরা নিয়ে পেছন পেছন ছুটছে। হেলিকপ্টার হুজুর সাউদ কিং প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানবেশে আচকান উড়িয়ে, পাগড়ি দুলিয়ে, মঞ্চ কাঁপিয়ে রাজসিক প্রবেশ করল। সামনের স্লোগান আরও জোরালো হলো। স্লোগান আরও কিছু সময় চলতে দিয়ে হেলিকপ্টার হুজুর মুখটুখ মুছে, দাড়ি মোবারকে আঙুল সঞ্চালন শেষে সবাইকে দুই হাত দিয়ে থামার ইশারা দিলেন। ইমানি বলে বলীয়ান উত্তেজিত তৌহিদি মুসলিম জনতা আরও জোরে জোরে মারাত্মক মারাত্মক বিশেষণ লাগিয়ে স্লোগান দিয়েটিয়ে একসময় ক্লান্ত হয়ে থামল। একটা 'ইশপিশাল' কাপে তার জন্য চা আনা হলো। মুহতামিম শুরু থেকেই হেলিকপ্টার হুজুরের সঙ্গেসঙ্গেই আছে। এবার সঞ্চালক মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে হুজুর আসায় দেরি নিয়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইল। এরপর হুজুরের নাম ঘোষণা করল। ওয়াজের মাঠ এবার পুরোপুরি জমে উঠেছে। লোকসমাগম আরও বেশি হয়েছে ইতিমধ্যেই। হেলিকপ্টার হুজুরের ওয়াজের সঙ্গে সামনের মুসল্লিয়ানেকেরাম হু, হা, আলহামদুলিল্লাহ, সোবানাল্লা ইত্যাদি বলে ওয়াজে অংশগ্রহণ করতে লাগল।

মাহমুদ সন্ধ্যা থেকে জুয়েলকে ঝোলাচ্ছে। যতবারই জুয়েলকে বলেছে 'চল ছাদে যাই', ততবারই মাহমুদ বলেছে ওয়াজ আরও জমে উঠুক। সন্ধ্যা থেকে মাহমুদকে চোখে চোখে রেখেছে জুয়েল, আড়াল হতে দেয়নি। হেলিকপ্টারের মুখ দিয়ে যখন আগুন ঝরছে, তখন মাহমুদ নিজেই জুয়েলের হাতে চাপ দিয়ে ইশারা দিল। সঙ্গেসঙ্গে জুয়েল মাহমুদকে নিয়ে ছাদে রওনা দিল। মাদরাসার নতুন ভবন ওয়াজের মাঠ থেকে মিনিট তিনেকের হাঁটাপথ। মাইকের চিৎকারে পুরো এলাকা প্রকম্পিত। একশো-দেড়শো গজ পরপর মাইক বসানো রয়েছে। জুয়েল আর মাহমুদ দেখল আশপাশে কেউ নেই। মাহমুদও মনে হয় এমন একটা পরিবেশই চেয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে পানির ট্যাংকের কাছে যাওয়াটা অত সহজ নয়। সিঁড়িজুড়ে বের হয়ে থাকা রড, শ্যাটারিংয়ের বাঁশ, পেরেকওয়ালা কাঠ ইত্যাদি পার হয়ে ওরা উঠল ছাদে। সেখানেও চারটা মাইকের হর্ন লাগানো আছে। হেলিকপ্টার হুজুরের হুংকার আর মুসল্লিদের সমর্থনের চিৎকারে অন্য কোনো কিছু শোনার জো নেই। দুজনেই উঠছে আর উত্তেজনায় কাঁপছে। দুজনের দুই ধরনের উত্তেজনা। জুয়েলের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা মাহমুদ তার 'ওইটা' মুখে নিক। ভিডিওতে এমন দেখেছে সে। মাহমুদ এত দিন রাজি ছিল না। সেদিন ভিডিও দেখানোর পর এখন তাকে যা বলা হয়, সে তাতেই রাজি হয়ে যায়। ওই দিনই অল্প একটু সময়ের জন্য নিয়েছিল। জুয়েলের বেশ লেগেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দিয়েছিল মাহমুদ। তারপর ওরা আর জোরাজুরি করেনি। দুজনেই লুঙ্গি পরে আছে। লুঙ্গি পরে এসব

কাজ করা ভালো। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকা যায়। লুঙ্গি খুলতে-পরতে কম সময় লাগে। ওরা ছাদের কিনারা ধরে পানির ট্যাংকের আড়ালে চলে এল। এসেই জুয়েল কাপড় তুলে মাহমুদকে বলল, 'ল, এইবার মুহে ল'। জুয়েল এবার যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। মাহমুদ তার 'ওইটায়' হাত দিতেই বীর্যস্খলন হয়ে গেল জুয়েলের। দুজনেই হেসে ফেলল। তারপর আবার মাহমুদ নাড়াচাড়া দেওয়ার কিছু সময় পরই আবার শক্তপোক্ত হয়ে গেল। তখন জুয়েল বলল, 'ল এহন, ল'। মাহমুদ হাঁটু গেড়ে বসল জুয়েলের সামনে। তারপর মুখে নেওয়ার আগে বলল, 'আরেকটু ডাইনে আহো, রাস্তা দিয়া কেউ লাইট মারলে তোমার পিঠ দ্যাহা যাইব'। জুয়েল অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু ডানে চেপে যেতে যেতে বলল, 'আর যাওন যাইব না, তাইলে পইড়া যামু। এহন মুহে ল, নকরামি করিস না'। মাহমুদ তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'আরে, কই পইড়া যাইবা? আমি ধরুম না?' জুয়েল দুইদিকে দুই পা হালকা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আয়'। মাহমুদের ভেতরটায় রাইসমিলের মতো ধক ধক করছে। সে জুয়েলের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে 'ওইটা' ধরার বদলে কোমরের বরাবর দুই হাত দিয়ে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দিল এক ধাক্কা! জুয়েল আটকানোর কোনো সুযোগই পেল না। 'আঃ' -বলে একটা চিৎকার দিল তিনতলার ছাদ থেকে নিচে পড়তে পড়তে, যেখানে রয়েছে মাদরাসার নতুন রান্নাঘর করার প্রাথমিক ফাউন্ডেশন শেষ করা রড ওঠা পিলারের অংশ, ভাঙা ইট, পেরেক ওঠা তক্তা, বাঁশ ইত্যাদি। মাহমুদ জুয়েলকে এমন জায়গায় এনেছে, যাতে নিচে পড়া জুয়েলের বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। মাইকের প্রচণ্ড আওয়াজে জুয়েলের চিৎকারে শব্দ সবচেয়ে নিকটবর্তী কারো কানেও পৌঁছাল না। মাহমুদ ধীরপায়ে নামতে লাগল। বুকের মধ্যে আগের চেয়েও বেশি ধক ধক করছে। যখন দোতলায়, তখন একটা লাইটের আলো চোখে পড়ল। কেউ রাস্তা দিয়ে লাইট মেরে যাচ্ছে। সে আবার ওপর-নিচ সব জায়গায় লাইট মারতে মারতে যাচ্ছে। মাহমুদ সুবিধামতো একটা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। লাইট অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর নেমে গিয়ে মাহফিলে ওদের মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

চলছে ওয়াজ, চলছে হেলিকপ্টার হুজুরের জ্বালাময়ী বক্তব্য। এখন সে ওয়াজ করছে দ্বীনের নবীর দারিদ্র্য নিয়ে। দয়াল নবী একটা খুরমা খাইয়া দিনের পর দিন পার করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শেষে ওয়াজ শুরু করলে ইসলামে দানের মহিমা। দিনের খেদমতে কোন কোন খলিফা কী সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ নির্মাণে দানের সুফল, তিনশো তের সাহাবির কাহিনি এসব। এরপর সে বহু মুহতামিম আর নওশাদ চৌধুরীর বহু কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সামনে নিয়ে এল। সবাইকে হাত খুলে দান করতে বলা হলো নির্মিতব্য মসজিদ-মাদরাসার জন্য। শুরু হলো দান করার প্রতিযোগিতা। এলাকার মেম্বার প্রথম দিল এক লাখ টাকা। মাইকে তার নাম ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কারও মাথায় প্রশ্ন এল না একজন ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মেম্বার দান করার মতো এক লাখ টাকা কই পেল। দিনের খেদমতে সে একলাখ টাকা দান করেছে, এ-ই বড় কথা। কোত্থেকে সে টাকা আসছে, সেটা মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। সর্ব নিম্ন যে এক হাজার টাকা দেবে, তার নামও মাইকে ঘোষণা করবে হেলিকপ্টার হুজুর। হেলিকপ্টার হুজুরের মুখে নিজের নাম শোনার লোভে অনেকেই

দান করল। সে নাম লিখে রাখছে নওশাদ চৌধুরীর ভাতিজা মোস্তাক। নগদ টাকা ছাড়াও কেউ দিচ্ছে সিমেন্ট কেনার প্রতিশ্রুতি, কেউবা রড দেবে, কেউ বালি। যত সময় যেতে লাগল, দান গ্রহণের তালিকা তত লম্বা হতে লাগল।
মাহফিল শেষ হতে হতে রাত বারোটা বেজে গেল। হেলিকপ্টার হুজুরের কাল পাশের থানায় মাহফিল আছে বলে সে আজ কমিটির সভাপতির বাড়িতে থেকে যাবে। ফজরের নামাজ শেষ করেই চলে যাবে। একথা শুনে নওশাদ চৌধুরী আকাশের চাঁদ হাতে পেল। এতে করে নওশাদ চৌধুরীর মান-ইজ্জত-সম্মানের মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত হলো। ওয়াজ মাহফিলের ফাঁকে গিয়ে মুহতামিম যখন নওশাদ চৌধুরীকে কথাটা বলল, তখন নওশাদ চৌধুরী খুশিতে মুহতামিমকে জড়িয়ে ধরে চকাস করে একটা চুমা দিয়ে বসল। মুহতামিম কেমন যেন একটু কেঁপে উঠল। হেলিকপ্টারের জন্য 'ইশপিশাল' রান্না হয়েছে আগেই। একটা খাসি জবেহ হয়েছে, খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে কালিজিরার পোলাও, পুকুরের কাতল মাছ, এমন নানা কিছু। হেলিকপ্টারের সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা সোহেলের কানে কানে বলল, 'সোহেল ভাই, সারাদিন আমার খাটাখাটনি কম যায় না। শরীলডা ম্যাজম্যাজ করতাসে, হাত-পা বিষ করতাছে, ভাই। 'ইশপিশাল' সেবাযত্নের জন্য একটা ছাত্র দেওয়া যায়?' সেক্রেটারি যখন এই মাদরাসায় পড়ত, তখন সোহেল মাওলানা ছিল তার সিনিয়র ছাত্র ভাই। সোহেল তাকে নিশ্চিত করে বলল, 'একজন না, যে কয়জন দরকার, দেব। চিন্তার কোনো কারণ নাই। তোমার ওস্তাদেরও লাগবে?' এর জবাবে সেক্রেটারি 'ছি! ছি!' বলে জিভ কাটল। সোহেল তার চোখে সবচেয়ে সুন্দর, সুশ্রী, ফরসা স্বাস্থ্যবান ছাত্র টগরকে ব্যবস্থা করে রাখল।
সকাল আটটার দিকে রাজমিস্ত্রি আবদুল হাকিম তার হেলপার বাদলকে পাঠাল নির্মিতব্য নতুন রান্নাঘরের পাশ থেকে রড বাঁকা করার যন্ত্র আনতে। সেখানে এসেই বাদল 'খুন খুন লাশ লাশ' বলে চিৎকার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দৌড়ে এল আরও কয়েকজন রাজমিস্ত্রি। গিয়ে দেখে কেউ একজন উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছে। তার পিঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা রড। সেখান থেকে রক্ত পড়ে জমাট বেঁধে গেছে। তাতে ভনভন করে মাছি উড়ছে। এর মধ্যেই মাদরাসার ছাত্ররাও ছুটে এসেছে। এসেছে মাদরাসার শিক্ষক আবু বক্কর। এসে দেখল নিহত ছাত্র হেফজখানার আরিফুল হক জুয়েল, যে কিনা মাদরাসা কমিটির সহসভাপতি আবদুল গফ্ফার পাটোয়ারীর দূরসম্পর্কের শালা। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে গেল মুহতামিমের কাছে। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে শুরু করল। রুম অন্ধকার। মশারি টানানো। ফজরের সালাত আদায়ের পর হেলিকপ্টার হুজুরকে বিদায় দিয়ে সে আবার একটু শুয়েছিল। উঠে বসতে বসতে বলল, 'কী ব্যাপার, আবু বক্কর? সাতসকালে হাঁপাও ক্যান?'
– একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘইটা গেছে, হুজুর। আপনে চলেন আমার লগে। সভাপতিরে খবর দেন, থানায় ফোন করেন।
– আরে, কী হইছে, কবা তো!
– খুন হুজুর! খুন হইছে!' মুহতামি তার খাট মোবারক ছেড়ে নিচে নেমে এল।
– কও কী? কে খুন হইছে? কোথায়?

– নতুন রান্নাঘরের পাশে।

খালি গায়ের ওপর কোরা গেঞ্জিটা চাপিয়ে দ্রুত প্রায় দৌড়ে আবু বক্করের সঙ্গে বেরিয়ে এল মুহতামিম। তার রুমের মধ্যে থাকা ছাত্রটি ইলাস্টিক দেওয়া পাজামা পরে, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বের হলো নতুন রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে আরও লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে মাদরাসার ছাত্রই বেশি। এক কোণে মাহমুদও আছে। সবাই এসে জুয়েলকে চিনতে পেরেছে। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে নওশাদ চৌধুরীও এসে হাজির হলো। এসে চোখের ইশারায় মুহতামিমকে জিজ্ঞেস করল কীভাবে কী হলো? ধীরে ধীরে আরও লোক এসে জমা হতে শুরু করল। সবারই ধারণা, গতকাল রাতে যখন ওয়াজ চলছিল, তখন হয়তো জুয়েল সিগারেট খেতে ছাদে উঠেছিল। সেখান থেকে অসাবধানতার কারণে পড়ে গেছে। জুয়েলের সিগারেট, এমনকি গাঁজা-ইয়াবা খাওয়ারও অভ্যাস আছে, তা এই মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক সবাই মোটামুটি জানে। কিন্তু কমিটির আত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে কেউ তেমন কিছু বলত না। নওশাদ চৌধুরী এর মধ্যেই থানার ওসিকে ফোন করেছে। সে ফোন ধরছে না। ফোন করেছে মাদরাসা কমিটির সেক্রেটারি আলতাফ ব্যাপারীকে, এক নম্বর সহসভাপতি, অর্থাৎ জুয়েলের দুলাভাই গফ্ফার পাটোয়ারীকেও। গফ্ফার পাটোয়ারীকে ফোন করে বলেছে, 'তোমার হালা কাইল ওয়াজের সময় ছাদে গাঞ্জা টানতে যাইয়া পইড়া গিয়া এন্তেকাল করছে'। ওসির এত সকালে ফোন ধরার কথা নয়, তা নওশাদ চৌধুরী জানে। আস্তে আস্তে এলাকা ভেঙে মানুষ এসেছে লাশ দেখতে। নওশাদ চৌধুরী সবাইকে কড়া করে বলে দিয়েছে, কেউ যেন লাশের গায়ে হাত না দেয়। হোক জুয়েল ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে, তার পরও বিষয়টি পুলিশ কেস। কেউ হাত দিলে ফেঁসে যাবে। এর মধ্যে জুয়েলের মা চলে এসেছে। তার বাবা বিদেশে থাকে। জুয়েলের মা বুক চাপড়ে কাঁদছে আর ছেলের কাছে যেতে চাইছে। কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। চারজন মহিলা তাকে ধরে রেখেছে। পুলিশ আসতে আসতে সাড়ে নয়টা বেজে গেল। তাও ওসি নিজে আসেনি। একজন এসআই আর তিনজন কনস্টেবল এসেছে একটা পিকআপ নিয়ে। যারা এতক্ষণ ছবি তুলছিল, ভিডিও করছিল, তারা পুলিশ আসার পর ক্ষান্ত হলো। ছাদে গিয়ে পুলিশ অনেকগুলো সিগারেটের ফিল্টার, সিগারেটের তামাক খুঁজে পেল। আর পেল জুয়েলের টুপি। এসআই সুরতহাল শেষ করে মোটা পাতার হোগলায় লাশ মুড়িয়ে গাড়িতে উঠিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে নওশাদ চৌধুরীর কাছে গেল মুহতামিম আর নওশাদ চৌধুরীর সঙ্গে 'ইশপিশাল'ভাবে দেখা করতে। কোনো রকম ভণিতা না করে এসআই নওশাদ চৌধুরীকে বলল, 'কী করব বলেন। ওসি স্যার আমারে সব শিক্ষকগো থানায় নিয়া যাইতে কইছে। চায়ের দাওয়াত দিছে'। থানার চায়ের দাওয়াত শুনে নওশাদ চৌধুরীর বুকটা ধক করে উঠল। এই চায়ের অর্থ সে জানে। এমন দাওয়াত আগেও দেওয়া হয়েছে সবাইকে।
তাও নিজের মাদরাসার জন্য না। পাশের থানার হাফেজ মাওলানা হাফিজুর রহমান নামের এক শিক্ষক তার মাদরাসার শাহপরান নামের এক ছাত্রের পেছনে লাগল। তিন-তিনবার শিশুটিকে ধর্ষণ করেও ব্যর্থ হয়। তারপর তাকে কৌশলে বেড়াতে নিয়ে যায় তার বাড়ি।

এরপর হাত-পা বেঁধে শিশুটিকে ধর্ষণ করে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে। তারপর সে শিশুটিকে নিজের বাড়ির খাটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। এরপর লুকাতে যায় তারই এক বন্ধু এই মাদরাসার সাবেক শিক্ষক লুৎফর মাওলানার কাছে। পরে আশপাশের লোকজন সেই হাফিজুরের বাড়ি থেকে পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে এসে শাহপরানের লাশ পায় পুলিশ। শাহপরান খুবই ভালো ছাত্র ছিল। মাদরাসার সবাই তাকে খুব পছন্দও করত। পুলিশ শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছিল হাফেজ মাওলানা হাফিজুরকে। সে তার দোষও স্বীকার করেছিল। কিন্তু তারপরও সবাইকে থানায় চা খেতে যেতে হয়েছিল।

নওশাদ চৌধুরী বুঝতে পারছে এখন যদি এই এসআইয়ের হাতে চা-পানির খরচ দেওয়া না হয় তো সবাইকে থানায় নেবে চা খেতে। মুহতামিম নওশাদ চৌধুরীর কানে কানে কিছু একটা বলল। এইসব ঝামেলা সবসময় আলতাফ ব্যাপারী দেখে। সে গতকাল একটা কেসের ব্যাপারে জজ আদালতে গেছে বলে আসতে পারেনি। আলতাফ ব্যাপারী থাকতে এসব নিয়ে ভাবতে হতো না নওশাদ চৌধুরীকে। নওশাদ চৌধুরী এসআইকে নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল। সেখানে গিয়ে চালের আটার রুটি আর গরুর ভুনা মাংস দিয়ে নাশতা করিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডেল ছুঁড়ে দিল, যেভাবে ক্ষুধার্ত কুকুরকে মানুষ খাবার ছুঁড়ে দেয়। সেই বান্ডেল দেখে এসআই হায় হায় করে উঠল।

'এইডা কী দিলেন, ভাই? স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে বলাৎকার শেষে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি এত চিকন বান্ডিল দিয়া ক্যামনে কী করুম? আপনে আর বড় হুজুর একটু থানায় চলেন'।

নওশাদ কোনো কথা না বলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে আরও একটি পঞ্চাশের বান্ডেল ছুঁড়ে মারল এসআইয়ের দিকে। তারপর বলল, 'এই পোলার দুলাভাই আমগো মাদরাসার কমিটির এক নম্বর সহসভাপতি। মামলা-মুমলা যা করার হেই করবে। আপনে টেনশন নিয়েন না। দরকার হইলে মুহতামিমরে নিয়া যান। আমি এহন ঘুমামু। আমারে আর জ্বালাইবেন না। আসসালামু আলাইকুম'। এরপর নওশাদ চৌধুরী অন্দরে চলে গেল। এসআই বুঝতে পারল, এখানে কচলাকচলি করে আর লাভ নেই। নওশাদ চৌধুরীকে সে কেন স্বয়ং ওসিও থানায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তবে যে করেই হোক, এসআই এই কেসের আইও হতে চায়। সে আঙুল বাঁকা করতে জানে। সোজাআঙুলে এখন ঘি উঠবে না, বুঝতে পেরে সে নওশাদ চৌধুরীর গৃহ ত্যাগ করল।

◆ ১৯ ◆

পুরো মাদরাসায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। আজ আর বিছানায় প্রস্রাব করা দল কান ধরে দাঁড়িয়ে নেই। মাদরাসায় এখন পুলিশের আনাগোনা হবে, সাংবাদিক আসবে। উল্টোপাল্টা কিছু হলে ঝামেলা। তবে কেউ মুখে কিছু না বললেও জুয়েলের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে নির্যাতিত অনেক ছাত্রই মনে মনে খুশি। মুহতামিম বোঝার চেষ্টা করছে যে কাজটা কেউ ঘটিয়েছে, না জুয়েল সত্যি সত্যি ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। ময়নাতদন্তের আগে কিছুই বোঝা যাবে না। জুয়েল আঠারো-উনিশ বছরের একটা কিশোর ছেলে। তাকে কেউ বলাৎকার করেছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং ওর বিরুদ্ধে অনেকে অনেকবার ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগ এসেছে। তবে আগে থেকেই কিছুই বলা যায় না। জুয়েল কমিটির সহসভাপতি গফ্‌ফার পাটোয়ারীর দূরসম্পর্কের শালা। কোনো শিক্ষক জুয়েলের সঙ্গে এসব করার সাহস দেখাবে বলে মনে হয়না মুহতামিমের। লাশ প্রথম দেখা রাজমিস্ত্রি ছেলেটাকে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। মুহতামিমকে নেয়নি। রাজমিস্ত্রি ছেলেটাকে হয়তো ছেড়ে দেবে। তবে এ কাজ যদি কেউ করে থাকে, তবে তা যত সহজে বের হবে, ততই ভালো। না হলে পানি ঘোলা হতেই থাকবে। আর পুলিশ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ওস্তাদ।

দুপুর বারোটার দিকে জুয়েলের মা থানায় একটি হত্যা মামলা করল। জুয়েলের মা গফ্‌ফার পাটোয়ারীর দূরসম্পর্কের খালাশাশুড়ি। তার স্বামী, অর্থাৎ জুয়েলের বাবা থাকেন সৌদি আরবে। জুয়েলের মা আর গফ্‌ফার পাটোয়ারীকে নিয়ে এলাকায় অনেক মুখরোচক কথাবার্তা চালু আছে। এ মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তে যদি দেখা যায় জুয়েলকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তাহলে মাদরাসার শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে তাদের মতো করে তদন্ত চালিয়ে যাবে পুলিশ। সভাপতি নওশাদ চৌধুরীর সঙ্গে সহসভাপতির সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। বিশেষ করে মাহফিলের টাকাপয়সা নিয়ে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবে নওশাদ চৌধুরীর সঙ্গে এক্ষুনি সম্পর্কের আরও অবনতি চায় না গফ্‌ফার পাটোয়ারী। গফ্‌ফার পাটোয়ারীর ব্যবসা নদী থেকে বালু উত্তোলন। এটাই সবাই জানে। তবে তার আরও একটা ব্যবসা আছে, সেটা জানে নওশাদ চৌধুরী। ফলে এখন নওশাদ চৌধুরীকে ঘাঁটালে ঝামেলা গফ্‌ফারের।

সকাল থেকে টগর কিছুই খায়নি। ওর জ্বর জ্বর লাগছে। প্রচণ্ড ব্যথায় টয়লেটে যেতে ভয় পাচ্ছে। এমনিতেও ছোট থেকে টয়লেটে যেতে ভয় পেত টগর। কারণ, ওর পাইলসের সমস্যা রয়েছে। যখন ওর বাবা বেঁচে ছিল, তখন কয়েকবার ডাক্তার দেখিয়েছিল। তেমন কোনো ফল না পাওয়ায় এই মুহতামিমই ওকে পানি পড়া দিয়ে চিকিৎসা করেছিল। গতকাল হেলিকপ্টার হুজুরের সেক্রেটারি যখন ওর সঙ্গে এই 'খারাপ কাজ' করেছে, তখন ও ধরেই নিয়েছিল ও বোধহয় মারা যাচ্ছে। দুই-দুইবার জ্ঞান হারিয়েছে টগর। টগর বুঝতে পেরেছে, কাজটা সেক্রেটারি হুজুর করেনি। টগরের পেছনে যে দুষ্ট জিন লেগেছে, সেই এই কাজ

করিয়েছে। হেলিকপ্টার হুজুরের মতো অত ভালো বক্তার সেক্রেটারি এমন কাজ কখনোই করতে পারে না। এটা টগর বিশ্বাস করে না। শুধু টগর কেন, এই দেশের কেউই বিশ্বাস করবে না। হাফেজ মাওলানারা এমন কাজ করতে পারে না, এমন বিশ্বাস ও ধারণা এই হুজুরেরাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ঢোকাতে পেরেছে। কিছুদিন আগে তো চরমোনাই হুজুর বলেছে, 'কোরআন হাদিসের আলো যার মধ্যে আছে, সে কখনো ধর্ষক হতে পারে না'। এটা এ দেশের ৯৯.৯৯% মুসলমান তা বিশ্বাস করেছে।
দুপুরের ক্লাসের সময় টগর টয়লেটের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে দুই আঙুল দেখাল। দুই আঙুল তোলার মানে হলো সে বড়টা করার জন্য এস্তেনজায় যাবে। এক আঙুল তোলা মানে ছোটটা, দুই আঙুল তোলা মানে বড়টা আর তিন আঙুল তোলা মানে অজু ছুটে গিয়েছে। সে এখন অজু করতে যাবে। এসব টগর মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর আস্তে আস্তে শিখে নিয়েছে। আজকাল বড়টার কথা ভাবলেই কান্না পায় ওর। প্রচণ্ডব্যথায় টয়লেটে গিয়ে মুখ চেপে ধরে কাঁদে। সকালে দেখেছে তাজা রক্ত পড়ছে। এখন কী হয় কে জানে? সকাল থেকে ক্লাসে ওস্তাদরা থাকার পরও অনেক ছাত্রই ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছে, ফিসফাস করে টিপ্পনী কেটেছে। খুব লজ্জা লেগেছে ওর। সবাই কি তাহলে বুঝে গেছে রাতে ওর সঙ্গে কী হয়েছে? কিন্তু বিষয়টি তো ঘটিয়েছে জিন। ওরা বুঝল কী করে?
টয়লেটে গিয়ে দেখল অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। রক্ত ঝরছে। আবারও ব্যথায় মুখ চেপে ধরে কেঁদেছে। চোখে যাতে কান্নার পানি না থাকে, সে জন্য ভালো করে অজু করে ক্লাসে যোগ দিল। রাতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল টগরের। মুহতামিমকে জানানোর পর সে ওকে পানিপড়া দিল। সেই পানিপড়া খেয়ে দুইবার বমি হলো। রাতে আর কিছুই খেতে পারল না।
খাবে কীভাবে? শীতকাল আসার আগে আগে রান্নাঘর ভরে যায় মুলায়। কম দামে পাওয়া যায়। রান্না দেখলে কান্না পায় ছাত্রদের। মনে হয় হলুদ গোলা পানির মধ্যে কিছু মুলা গোল গোল করে কেটে ছেড়ে দিয়েছে। এখন চলছে মুলার দিন, কয়েকদিন আগে ছিলো লাউয়ের দিন। দিনের পর দিন লাউ। তারপর হয়তো আসবে বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম এইসব। বাজারে যখন যে সবজির দাম সবচেয়ে কম থাকে সেগুলো বাজার ভাঙার পর নাম মাত্র দামে ভ্যান গাড়ি ভরে মাদরাসায় নিয়ে আসে বাবুর্চি মন্টু আর ঐদিনের জন্য রান্নার কাজে মন্টুকে সাহায্য কারার জন্য ছাত্ররা।
খাবার বিষয়টি নিয়ে 'শিশুধর্ষণের' একটি বড় সুযোগ নেয় বাবুর্চি মন্টু। মাদরাসায় দুই ধরণের ছাত্র রয়েছে। একদল খোরাকি অর্থাৎ খাবারের টাকা দিয়ে খায়, আরেক দল এতিম। যারা খোরাকি দিয়ে খায় তাদের খাবার একটু আলাদা হয়। একটা আইটেম হয়তো বেশি থাকে। একটা ডিমের অর্ধেকটা বা হ্যাচারির মাছ। মন্টু মাঝে মধ্যে কিছু এতিম ছাত্রকে খোরাকি দেয়া ছাত্রদের খাবারের থেকে চুরি করে দেয় অথবা একটা ডিম ভেজে দেয়। বিনিময়ে মন্টুর স্টোরে ঐ ছাত্রকে পাজামা খুলতে হয় সঙ্গোপনে। মন্টুকে নিয়েও মাদরাসায় কম ঘটনা নাই। অনেকবার বিচার বসেছে তাকে নিয়ে। কিন্তু তাকে চাকরি থেকে বের করে দিতে পারেনি কখনও। কারণ মন্টু অনেকের অনেক কিছু জানে। আর সেই জানার সুযোগটা সে প্রায়ই

নেয়। তাকে হটানো অতো সহজ না। তাছাড়া জেহাদি ওস্তাদ, কবির হুজুর, মোক্তার ওস্তাদকে কি সে স্টোর রুমের চাবি দিয়ে কম উপকার করেছে? সেখানে চটের বস্তা বিছানো আছে। জেহাদি ওস্তাদ প্রায়ই তাহাজ্জুদ নামাজের পর নাদুস নুদুস এক ছাত্র নিয়ে স্টোর রুমে যায়। একদিন চাবি চাইতে আসলে মন্টু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল 'হুজুর আমিও তো অনেকদিন বাড়ি যাই না, আইজ একটু আমিও...' এরপর থেকে জেহাদি ওস্তাদের শেষ হওয়ার পরপরই ঢুকে যায় মন্টু। কিন্তু একদিন ধরা পরে গিয়েছিলো ছাত্রদের কাছে। আর তা নিয়ে কত হৈচৈ। তবে মুহতামিম ঘটনা মাদরাসার বাইরে যেতে দেয়নি। বিচারের দায়িত্ব পড়েছিল জেহাদি ওস্তাদ আর কবির হুজুরের উপর। তারপর থেকে সাবধান হয়ে যায় মন্টু। কিন্তু কিছু বজ্জাত ছাত্র সব সময় তক্কে তক্কে থাকে আর ঝামেলা পাকায়। মন্টু ভেবেছে একদিন এই বজ্জাতদের জামাল গোটা খাওয়াবে। কিন্তু সংগ্রহ করতে পারছে না বলে খাওয়ানো হচ্ছে না।

দুইদিন পর জুয়েলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা এল, তাতে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল গফ্ফার পাটোয়ারী। জুয়েলকে তো কেউ ধর্ষণ করেইনি, বরং ওর লিঙ্গের মাথায় আর কাপড়ে ওরই বীর্য পাওয়া গেছে। রাতের বেলা প্রায়ই ছোট ছাত্রদের মশারির মধ্যে পাওয়া যেত, সে খবর গফ্ফার পাটোয়ারীর কানে কয়েকবার গেছে। এ নিয়ে বিচারে মুহতামিম, এমনকি নওশাদ চৌধুরীও উপস্থিত ছিল একদিন। গফ্ফার ভেবেছিল, এই সুযোগে হয়তো নওশাদ চৌধুরীকে খানিকটা সাইজ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু এক ময়নাতদন্ত সবকিছু ওলটপালট করেদিল। গোল্লায় গেল ওসিকে দেওয়া নগদ পাঁচলাখ টাকা। দুঃখে-কষ্টে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে গফ্ফার পাটোয়ারীর। মেজাজটা অসম্ভব বিগড়ে আছে।

হেলিকপ্টার হুজুরের মাহফিলে অনেক টাকাপয়সা উঠেছে। শুধু মাহফিলের দিনই উঠেছে আঠারো-বিশ লাখ। তার কাছে ভেতরের খবর আছে। সব মিলিয়ে এই মাহফিলে এক থেকে দেড় কোটি টাকা উঠেছে। এলাকার বেশ্যার দালাল থেকে শুরু করে ছিঁচকে চোর পর্যন্ত বিরাট অঙ্কের চাঁদা দিয়েছে। রাস্তার কন্ট্রাকটর, জমির দালাল, সিনেমা হলের মালিক, চাতালের মালিক, বালু ব্যবসায়ী, কে না দিয়েছে টাকা? সেখান থেকে হেলিকপ্টার হুজুর নিয়েছে বক্তব্যের জন্য দুই লাখ, হেলিকপ্টার ভাড়া পঞ্চাশ হাজার আর মাহফিলে মসজিদ-মাদরাসার জন্য দানের কথা বলে দেওয়ার জন্য নিয়েছে পঞ্চাশ হাজার। এই গেল মোট তিন লাখ। আর টাকা কোথায়? পোস্টারে, মাইকে, ডেকোরেটরে, কারেন্টে, খাওনে–কোথাও একটা টাকাও খরচ হয়নি। এসব এমনি এমনিতে যে যার জায়গা থেকে মাহফিলে দান হিসেবে দিয়েছে। বাকি টাকা গেল কোথায়? গফ্ফার খুব ভালো করে জানে, মসজিদ-মাদরাসায় একটা টাকাও খরচ করবে না সুদি নশু। বাচ্চা বাচ্চা পোলাগুলো দিয়া ভিক্ষা করাবে আর সেই টাকা দিয়া পিঁপড়ার গতিতে কাজ করাবে। কেউ টাকা দিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করাতে চাইলেও সুদি নশু করাতে দেবে না। তাহলে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। হারামজাদাকে অনেকদিন ধরে সাইজ করারধান্দায় ছিল গফ্ফার। কিন্তু কোত্থেকে কী হয়ে গেল?

সপ্তাহখানেক পর মাহমুদসহ আরও জনা কয়েক ছাত্র মাদরাসা থেকে পালিয়ে গেল। এটা মাদরাসার জন্য নতুন কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই দিনই নতুন করে আঠারোজনকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। আরও দিন চারেক পর শুরু হলো নতুন রান্নাঘরের কাজ। সেখানে ভাঙা ইট, টিন, কাঠ ইত্যাদি সরাতে গিয়ে দুলাল নামের এক লেবার 'মোবাইল কার মোবাইল কার' বলে চিৎকার শুরু করে দিল। প্রাপ্ত মোবাইলটি নিহত জুয়েলের, তা অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল। এক কান দুই কান হতে হতে সে খবর গেল মুহতামিমের কানে। মোবাইল নিয়ে মুহতামিম কী করবে, বুঝে উঠতে পারল না। একসময় মোবাইলপ্রাপ্তির খবর চলে গেল গফ্ফার পাটোয়ারীর কানে, সেখান থেকে থানার ওসির

কানে। ওসি মোবাইল জব্দ করে সেখান থেকে বেশ কিছু পর্ন ভিডিও উদ্ধার করল। তার মধ্যে একটি ভিডিও পুরো কেসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আর সেটা হলো মাহমুদকে ধর্ষণের ভিডিও। কেসের মোড় একেবারেই অন্যদিকে ঘুরে গেল।
টগর শারীরিকভাবে খানিকটা সুস্থ হলেও ভালো নেই ওর মানসিক অবস্থা। সবাই তাকে এখন দুষ্ট জিনের বউ বলে ডাকে। তার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে। হয়তো সে আত্মহত্যাই করত কিন্তু হুজুরেরা বলেছে, আত্মহত্যাকারী চিরজাহান্নামি। সে জান্নাতে যেতে পারবে না। মাঝেমধ্যে ভাবে, এখান থেকে মাহমুদ ভাই, কাওছার ভাই, তরিকুল–এদের মতো টগরও পালিয়ে যাবে। কিন্তু ও পালিয়ে যাবে কোথায়? ওর তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সারাদিন চোখের পানি ফেলে। এর মধ্যে আবার একদিন জিন হুজুরের ঘরে ডাক এল। এখন আর জিন হুজুরের ঘরে যেতে ভালো লাগে না। কিন্তু সে যেতে বাধ্য। না হলে সে জিন চালান দিয়ে টগরকে মেরে ফেলবে বলেছে। টগর অনেক শুকিয়ে গেছে। ওর রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। পেটে ক্ষুধা থাকলেও খায় না। কারণ, তাতে ওর টয়লেটে যেতে হবে, সেই ভয়ে। কম খেলে যদি কম টয়লেটে গিয়ে পারে, সেই জন্যই কম খায়, পারতপক্ষে খায় না। মাদরাসায় রটে যায়, টগরের খারাপ বাতাস লেগেছে। আর এটা দুষ্ট জিনের কাজ। মাদরাসার অন্য ছাত্ররা এই দুষ্ট জিনকে সবাই চেনে। কিন্তু কেউ ভুলেও কোনো কথা বলে না।
জুয়েলের কেস স্তিমিত হয়ে আসার পর নওশাদ চৌধুরী মাহফিলের যাবতীয় আয় নিয়ে বসল মুহাতমিম আর মোস্তাকের সঙ্গে। নওশাদ চৌধুরী এই পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস করে না। সে নিজের নাম নিজে লিখতে না পারলেও হিসাব-নিকাশে সে খুবই পাকা। দীর্ঘদিন ধরে সুদের কারবার করে এসেছে। কেউ তাকে এক পয়সা ফাঁকি তো দিতে পারেইনি, বরং সে অনেককে ফাঁকি দিয়ে দেড়গুণ সুদ নিয়েছে, হাতিয়ে নিয়েছে অনেকের জামিজমা। ইতেমধ্যে সে মোস্তাকের কাছ থেকে পুরো হিসাব পেয়েছে। নগদ টাকা, ধান-চাল, মানত, গরু-ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি–এসব বিক্রি করা হয়েছে ধীরে ধীরে। এখন যা আছে, সবই নগদ টাকা। সবকিছু নিয়ে বাদ মাগরিব বসল মাদরাসায় নওশাদ চৌধুরী ওরফে সুদি নশুর খাস কামরায়। মাহফিলে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র দুজন এখনো দেয়নি। শ্যাম্পু, টয়লেট টিস্যু আর চকপাউডার দিয়ে দুধ বানানো দুধের কারবারি ফারুক দেয়নি তার প্রতিশ্রুতির আশি হাজার টাকা আর আদম ব্যবসায়ী খলিল দেয়নি তার প্রতিশ্রুতির দুই লাখ টাকা। দুজনেই বলেছে, সামনের শুক্রবারের মধ্যে দিয়ে দেবে। টাকার মোটামুটি একটা ছোটখাটো বস্তা নিয়ে বসল তিনজন। সব মিলিয়ে মোট আয় হয়েছে এক কোটি সতেরো লাখ উনিশ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন টাকা। সেখান থেকে হেলিকপ্টার হুজুরকে সব মিলিয়ে দিয়েছে তিন লাখ। খুচরা আরও খরচ হয়েছে হাজার দশেকের মতো। সেখান থেকে মুহতামিমের হাতে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বলল, 'এইটা তুমি আর তোমার বাকি মাওলানারা ভাগযোগ কইরা নিয়ো। বাবুর্চিরেও দিয়ো কিছু'। সঙ্গেসঙ্গে মুহতামিমের মুখ পাংশু হয়ে গেল। এবছর মাহফিলে যা আয় হয়েছে, তা গত বছরের চেয়ে দশগুণেরও বেশি। গতবছর সব মিলিয়ে উঠেছিল এগারো লাখের মতো। সেখান থেকে মুহতামিমকে দিয়েছিল দেড় লাখ

আর অন্য শিক্ষকদের দশ হাজার করে। এবছর এটা কী করল? এটা দিয়ে মুহতামিম কী নেবে আর বাকি শিক্ষক-বাবুর্চি এদেরই-বা কী দেবে? এরপর মোস্তাকের হাতে ২ লাখ ১৯ হাজার ২৫৬ টাকা দিয়ে বলল, 'এটা দিয়া মাদরাসা আর মসজিদের কাম চালাইতে থাক'। মুহতামিমের বুকটা ভেঙে গেল। মাহফিলের জন্য মুহতামিম আর অন্য শিক্ষকেরা কম খাটেনি। যত টাকা উঠেছে, তার পুরোটাই বলতে গেলে উঠেছে হেলিকপ্টার হুজুরের কল্যাণে। আর তাকে এই মুহতামিমই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর জন্য তাকে কম খাটতে হয়নি। তার বিনিময়ে এই প্রাপ্তি? এই প্রথম মুহতামিম নওশাদ চৌধুরীর ওপর মারাত্মকভাবে নাখোশ হলো। এমনটা সে মোটেই আশা করেনি। তবে মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা এই যে হয়তো মোস্তাকের সামনে বসে এটা দিয়েছে, পরে মুহতামিমকে আলাদা করে দেবে।
মাদরাসা থেকে বেরিয়ে নওশাদ চৌধুরী আর তার ভাতিজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল। আগে ভাতিজা মোস্তাক আর পেছনে নওশাদ চৌধুরী। ভাতিজার মাথায় টাকার বস্তা। নওশাদ চৌধুরী কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। টাকার বস্তাসহ ভাতিজা দৌড়ে পালাতেই পারে। এটা ভেবে সে নিজের পকেটে একটা পিস্তলও রেখেছে। আর সেটা পেট চুলকানোর ছলে ভাতিজাকে কৌশলে দেখিয়েও দিয়েছে। নওশাদ চৌধুরীর এখন বয়স ষাটের ওপরে। সামনের সংসদ নির্বাচনে সে এমপি ইলেকশন করবে। সরকারি দল নমিনেশন না দিলে সে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবে। আর এইসব টাকা সে ইলেকশনের কাজে খাটাতে চায়। ইলেকশনের তো বেশি দেরি নেই। সুদি নশু নিজে এত বড় মাদরাসা দিলেও নিজের কোনো ছেলেমেয়েকে মাদরাসায় পড়ানোর মতো ভুল কাজ করেনি। ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার ছেলেমেয়ের তিন ছেলে থাকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে। সেখানে প্রত্যেকের বাড়ি আছে। আর মেয়েও থাকে বিদেশে। জামাই নিয়ে কানাডায় আছে। আরও একটা মেয়ে হয়েছিল তার দ্বিতীয় বউয়ের ঘরে। এক মামলায় জেতার জন্য প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে নিজ হাতে জবাই করে তাকে প্রতিপক্ষের পাট খেতে যখন ফেলে রেখেছিল, তখন মেয়েটার বয়স ছয় বছর। জমিজমার সেই কেসে জিতেছিল নশু।
এই মাদরাসা দেওয়ার পর সে প্রকাশ্যে সুদের ব্যবসা করে না ঠিকই কিন্তু ব্যাংকে তার কোটি কোটি টাকা আছে। আর তা থেকে সুদও আসে কোটি টাকা। এই মাদরাসা তার আয়ের অন্যতম একটা বড় উৎস। সে তার কোনো উৎসকে ছোট করে দেখে না। অনেকেই বলে সুদি নশুর একটা টাকা যদি গুয়ের মধ্যে পড়ে তো সে ওই টাকাটাও তুলতে দ্বিধা করে না। এই মাদরাসা তাকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বানিয়েছে, চেয়ারম্যান বানিয়েছে। এখন স্বপ্ন সে এমপি হবে। তার টাকাপয়সার অভাব কখনোই ছিল না, এখনো নেই, নেই সম্মানের কমতি। কমতি নেই লোভ-লালসারও। চার-চারটা বিয়ে করে সুন্নত পালন করেছে। কিন্তু সন্তান নিয়েছে বড় বউয়ের ঘরে। আর যে যে বউয়ের যখন পেট হয়েছে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে পেট পরিষ্কার করে এনেছে। খালি একবার দ্বিতীয় বউয়ের পেটে এই মেয়েটা হয়ে গিয়েছিল।
তবে কচি পোলার প্রতি তার একটা ভিন্ন রকম খায়েশ সেই যুবা বয়স থেকেই। দিন দিন বড় হচ্ছে মাদরাসা। আজকাল স্কুলে লেখাপড়া হয় না বলে সবাই পোলাপান মাদরাসায় পড়াতে

চায়। মাদরাসায় পড়ানোর অন্যতম বড় কারণ তারা মনে করে কোনো বাবা-মায়ের একটা সন্তান যদি কোরআনের হাফেজ থাকে, তো পুরো পরিবারের জান্নাত নিশ্চিত। এ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট আলেমদের লাখ লাখ ওয়াজ রয়েছ। আজকাল নওশাদ চৌধুরী যখন মাদরাসার পাশ দিয়ে যায়, তখন তার মনে হয় সে তার নিজস্ব ব্যাংকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বছর বছর ছাত্রের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। একেকটা ছাত্র তার কাছে ফিক্সড ডিপোজিটের সমান। টাকার গাছ। মাদরাসার মধ্যে যখন দেখে ছাত্ররা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কোরআন পড়ছে, যখন পুরো মাদরাসা গমগম করে, তখন সে তার অর্থ না বুঝলেও মনে মনে ভাবে, এটাই প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের বাগান। যে বাগানের ফল অতি মিষ্ট। আলহাজ্ব নওশাদ চৌধুরীর আয়ের অনেক পথ থাকলেও দিন দিন মাদরাসা একটা বড় আয়ের উৎস হয়ে উঠছে। সারা বছর এতিমখানার নামে টাকা আসতেই থাকে। ছাত্ররা যে শুধু বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকাপয়সা, চাল-ডাল আনে, তা-ই নয়, তার জামাইসহ আরও অনেক লোক নানা জায়গা থেকে মোটা অঙ্কের অনুদান পাইয়ে দেয়। তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সবচেয়ে বড় উৎস।

ঘরে গিয়ে টাকাগুলো সিন্দুকে রাখার পর মোস্তাককে এক হাজার টাকার দুটো নোট দিয়ে বলে, 'নে, হাতখরচা তোর'।

বাবা-মা হারা মোস্তাককে তো নওশাদ চৌধুরীই বড় করেছে। আইএ পর্যন্ত পড়িয়েছে।

সন্ধ্যার পর মুহতামিম অত্যন্ত আশা নিয়ে নওশাদ চৌধুরীর কাছে গিয়ে বলল, 'এই সামান্য কয়টা টাকা দিয়া কী করুম? আর কিছু দিবেন না?'
– আর কিছু মানে? তোমারে আর ট্যাকা দিমু ক্যান?
– এইডা একটা কথা কইলেন? এইখানে আমার হক নাই?
– তোমার আবার কিসের হক? এইডা আমার মাদরাসা। ট্যাকা উঠছে। তোমরা কষ্ট করছ বকশিশ দিছি, আর কিয়ের হক? মাথা ঠিক আছে?
সামনে থেকে এতগুলো টাকা নিয়ে নওশাদ চৌধুরী পকেটে ভরছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না মুহতামিম। সে বলল, 'এইডা কিন্তু ইনসাফ হইতেছে না হাজি সাব। কষ্ট যা করণের আমরাই করছি। এত্তগুলো মানুষের হক নিয়া আপনে একা পকেটে ভরবেন, এইডা কেমুন কথা?' এইবার সুদি নশু তার আসল রূপে এল, 'তোমারে এক কুঠি ট্যাকা দিলে খুশি হইতা? আমারে ইনসাফ শিখাও? আমারে ইনসাফ শিখাও? এত্ত জলদি নিজের জায়গা ভুইলা গ্যালা? আছিলা রাস্তার ফহির। ভিক্ষা কইরা খাইতা আর মচ্ছিদে ঘুমাইতা। হেই জাগাইদ্দা তুইলা আইনা তোমারে আমার ঘরে থাকতে দিছি, মাদরাসা কইরা দিছি, এইগুলা কি নিজের বাপের সম্পত্তি মনে করছ? বেশি লোভ কইরো না, মাওলানা। তোমার মাদরাসার মাস্টরেরা একের পর এক ঝামেলা করে। ধইরা ধইরা পোলাগো পুটকি মারে আর আমারে হেই ঝামেলা মিটাইতে হয়। আর আমারে হক শিখাও? আমারে ইনসাফ শিখাও? মাদরাসা কইরা দিছি, মসজিদ কইরা দিছি, কোনোডাই তো কন্ট্রোল করতে পারো না। আবার আইছো ট্যাকার ভাগ চাইতে? পিছনের কথা ভুইল্লা যাও ক্যামনে? তোমারে আমি কী দেই নাই? আবার মুখে মুখে তর্ক করো? লাত্থি মাইরা মুখ ভাইঙ্গা দিমু। নিমকহারাম কোহানকার! রাইতের বেলা খুন কইরা আমার কাছে আইয়া আমার পাও জড়াইয়া ধরছিলি মনে আছ?' নওশাদ চৌধুরী খেপে আগুন হয়ে গেল।
'তিনমাস আগেও পুটকি মাইরা এক ছাত্ররে পিডাইয়া ঠ্যাং ভাঙছ। আমার হেইসব ট্যাকেল দিতে হয় নাই? এক হারামজাদা ব্যাত দিয়া ছাত্রের চৌখ নষ্ট কইরা দিলো। কী মনে করছ? আমি আর কত ঝামেলা ঠ্যাক দিমু? এহন আইছ ট্যাকার ভাগ নিতে? পিছনের কথা ভুইল্লা যাও? পুহুরপাড়ে এহনও খোঁচা দিলে তোমার খুন করা ছাত্রের লাশ বাইর হইব। আমারে আইছ হক শিখাইতে? ইনসাফ শিখাইতে? এইসব থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারি সামলায় কেডা? বেশি তেড়িবেড়ি কইরো না, মাওলানা। চিনো আমারে? পুটকিতে চোতরা পাতা ঘইষ্যা দিয়া লাত্থি মাইরা রাস্তায় বাইর কইরা দিমু। আমি নশু, ভাত বিছাইলে তোমার মতো হাজার হাজার কাউয়া আইব। যাও, ভাগো। আইছে আমারে ইনসাফ শিখাইতে'।

কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে মুহতামিম নওশাদ চৌধুরীর ঘর ত্যাগ করল। কিন্তু বিষয়টা মোটেই হজম করতে পারছে না। মুখে কিছু না বললেও শরীরে প্রতিটি কোষ যেন বিদ্রোহ করছে মুহতামিমের। নওশাদ চৌধুরী তার জন্য আর মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, এ কথা মিথ্যা নয়। থানায় অনেক টাকাপয়সা দিতে হয়েছে, সেকথাও সত্যি। কিন্তু তাই বলে এমন অপমান? এখন এর কোনো জবাব না দিলেও একেবারে ছেড়ে দেবে না সে সুদি নশুকে। দিন দিন তার আচার-ব্যবহার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যতই বয়স বাড়ছে, ততই খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস, আজ আশপাশে কেউ ছিল না। আজ মনে হয় একটু বেশিই 'পানিপুনি' খেয়েছিল। মুখ থেকে বেজায় গন্ধ আসছিল। প্রথমে যদি বুঝতে পারত সে মাল খেয়ে আছে, তাহলে কথাটা এখনই বলত না। মুহতামিম আশা করেছিল এই মাহফিল থেকে সে অন্তত ২৫-৩০ লাখ টাকা ভাগে পাবে। অন্য শিক্ষকদের হাতে লাখখানেক করে টাকা দিতে পারবে। এখন সবাই কী ভাববে? ভাববে মুহতামিম টাকা নিয়েছে কিন্তু আমাদের দেয়নি, সব একা মেরে খেয়েছে।

আরও মাসখানেক পর টগর সিদ্ধান্ত নেয় সে মাদরাসা ছেড়ে পালাবে। কিন্তু মাহমুদ পালিয়ে যাওয়ার পর মাদরাসায় যে কড়াকড়ি হয়েছে, তাতে পালানো সহজ নয়। টগর মনে মনে ভাবে, একদিন না একদিন তার ঠিকই পালানোর সুযোগ আল্লাহ্ করে দেবে।

শুধু টগর নয়, কওমি মাদরাসার প্রায় সব শিশু ছাত্রই মনে মনে ভাবে, একদিন না একদিন সে পালাতে পারবে। তবে কেউ পারে, কেউ পারে না। এতিম শিশুদের পালিয়ে যাবার কোনো জায়গা থাকে না বলে তারা দিনের পর দিন দুমুঠো ভাত আর শোয়ার জায়গার জন্য মুখ বুজে ধর্ষিত হতেই থাকে।

নাইম আর মাদরাসায় ফেরত যাবে না। কোনোভাবেই যাবে না। আর সেই কারণে মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছে ওর। এই ছেলে কোনো মাদরাসাতেই টিকতে চায় না। এই নিয়ে এটা ওর চতুর্থ মাদরাসা চলছে। নাইমের মা আমেনা বুঝে ফেলেছে ছেলেটার পেছনে ইবলিশ শয়তান লেগেছে। এটা একমাত্র ইবলিশেরই কারসাজি। কোনো মাদরাসাই ভালো না, এটা তো আর হতে পারে না। নাইম এমনিতে খুবই অন্তর্মুখী ছেলে। সহসা মুখ ফুটে কিছু বলতে চায় না। তার মা তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছে, 'তুই মাদরাসায় কেন যাবি না?' নাইম কখনো কোনো জবাব দেয়নি। মাদরাসায় যা-ই হোক, ছেলেকে মাদরাসায় পড়াতেই হবে আমেনাকে, হাফেজ বানাতেই হবে। নাহলে যে আমেনার মুক্তি নেই। তার ধারণা, জীবনে সে অনেক অনেক পাপ করেছে। আর সেই সব পাপের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে তার একমাত্র ছেলে নাইম। ছেলে হাফেজ হলেই কেবল সে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। আর না হলে আমেনাকে চিরজাহান্নামি হয়ে থাকতে হবে মৃত্যুর পর।

আমেনার বয়স যখন নয়, তখন সে তার বাবাকে হারায়। মা আবার বিয়ে করে। তার মায়ের নতুন স্বামীর কাছে আমেনারও থাকার সুযোগ হয়। আমেনার মা বাসায় কাজ করত আর বাবা রিকশা চালাত। থাকত বেগুনবাড়ি বস্তিতে। দুপুরবেলা যখন ওর বাবা বাসায় খেতে আসত, তখন ওর মা বাসায় থাকত না। সেই সুযোগে ওর সৎবাবা ওর মুখে দুর্গন্ধযুক্ত গামছা গুঁজে দিয়ে ধর্ষণ করত। কিন্তু কিছুই করার ছিল না আমেনার। একদিন মাকে সব বলে দিল। ততদিনে তার মাসিক শুরু হয়েছে। মা সরকারি হাসপাতাল থেকে 'সুখী' নামক এক প্যাকেট বড়ি এনে বুঝিয়ে দিল কখন কীভাবে খেতে হবে। কিন্তু ওই বড়ি খাওয়ার পরও তার সৎবাবা তাকে ধর্ষণ করতেই থাকল। আমেনা মাকে জানাল, ওষুধ খাওয়ায় কোনো কাজ হয়নি, তার সৎবাবা এখনো প্রায় প্রতিদিন তার সঙ্গে 'ওই কাম' করেই যাচ্ছে। তখন তাকে মা বুঝিয়ে বলল, এই বড়ি 'ওই কাম' ফেরাতে পারে না। বরং 'ওই কাম' করার ফলে যাতে পেটে বাচ্চা না আসে, সেই জন্যই এই বড়ি। সেই মা যখন সাত রাস্তার মোড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেল, তখন আমেনার বয়স চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোতে পড়েছে। বুক উঁচু হয়েছে। তখন থেকে ওর সৎবাবা রাতের বেলা ঘরে আরও তিনজন পুরুষ নিয়ে এসে রাতভর জুয়া খেলত আর সবাই মিলে কবিরের বাংলা মদ খেত। ফাঁকে ফাঁকে ওকে একেকজন ধর্ষণ করত। এক রাতে জুয়ায় হারাতে হলো একমাত্র রিকশাটাও। পরদিন আমেনাকে নিয়ে বের হলো গ্রামে ফেরার উদ্দেশ্যে। দৌলদিয়া নামক এক স্থানে এক মোটা পান খাওয়া মহিলার ঘরে ওকে বসিয়ে সে গেল খাবার আনতে। সেই যে গেল, আজ পর্যন্ত আর তার দেখা মেলেনি। আমেনার তিন-চার দিন লাগল এটা বুঝতে যে ওর সৎবাবা ওকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়ে ভেগেছে। শকুনের হাত থেকে কুমিরের মুখে পড়ল আমেনা।

সারা দিনে ১০-১৫ জন খদ্দেরকে খুশি করার বিনিময়ে তিন বেলা খাবার ছাড়া আর কিছুই জুটত না। এভাবে তিন বছর কাটানোর পর একদিন 'আউট কল'-এ গেল ঢাকায়। খদ্দের বড়লোক কিন্তু সে কনডম ব্যবহার করবে না। বিনিময়ে মোটা টাকা দিতে চাইল। রাত আটটায় দালাল ওকে দিয়ে গেছে, সকাল আটটায় নিয়ে যাবে। আউট কলে সাধারণত সাত-আটজন বা তার বেশি খদ্দের থাকে। কিন্তু এখানে একজনমাত্র খদ্দের। খালা সব সময় বলে দিয়েছে কনডম দিয়ে কাজ করতে। এনজিওর আপারাও বলেছে। কনডম ছাড়া কাজ করলে নাকি কী রোগ হয়, যার কোনো চিকিৎসা নেই, ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়। আমেনা ভাবল, এখন যেভাবে আছি, তার চেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরাই ভালো। সে কনডম ছাড়া কাজ করতে রাজি হলো, বিনিময়ে আরও শর্ত দিল খদ্দেরকে। শর্ত হলো, তাকে যে টাকায় ভাড়া করা হয়েছে, সেই টাকাটা দালালের হাতে না দিয়ে ওর হতে দিতে হবে, সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার টাকা। আর দালাল আসার আগেই ওকে ছেড়ে দিতে হবে। বিনিময়ে খদ্দের যা খুশি করতে পারে, যেভাবে খুশি করতে পারে। খদ্দের বুঝতে পারল, মেয়েটি পালিয়ে বাঁচতে চায়। খদ্দের অনেক টাকার মালিক, কিন্তু বেচারার বউ দীর্ঘদিন ধরে প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছে। এখন বাপের বাড়িতে আছে বলে সে কাউকে বাসায় আনতে পেরেছে। এমন সুযোগ নাকি সে বছরে দুয়েকবার পায়। দীর্ঘদিন ধরে নারীসঙ্গ পায়নি বেচারা। বয়স চল্লিশের ওপরে। বোঝাই যায় এখনও যৌবনে একটু ঘাটতি হয়নি এই সুশ্রী সুপুরুষের। তার কথাবার্তা-ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারল, সে আল্লাখোদা মানে না, বিশ্বাসও করে না। কিন্তু মানুষটা অনেক ভালো। রাতে দুজনেই অনেক তৃপ্তি নিয়ে যা করার করল। সকালে যখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল আমেনা, তখন খদ্দের নিজেই ওকে ডেকে একটা খাম হাতে দিয়ে বলল, ছয়টা বেজে গেছে। আমেনা যদি পালাতে চায় তো তার এখনই বের হওয়া উচিত। সে যেখানে যেতে চায়, ড্রাইভার তাকে নামিয়ে দেবে। আমেনা জানাল, তাকে কারওয়ান বাজারে নামিয়ে দিলেই চলবে। গাড়িতে ওঠার আগে একটা ব্যাগে আমেনাকে তার বউয়ের পুরোনো কিছু কাপড়চোপড় ভরে দিল। এই নাস্তিক ব্যাটার আচরণে মুগ্ধ হয়ে সারা পথ কেঁদেছিল আমেনা। সেই রাতে আমেনা খদ্দেরের কাছ থেকে এইডস না নিয়ে এলেও নিয়ে এসেছিল নাইমের ভ্রূণ। গাড়ি থেকে কারওয়ান বাজারে নেমে খাম খুলে দেখল সেখানে ২৫টি লালচে রঙের চকচকে নোট। ছোট্ট একটা কাগজে লেখা,"পারলে এটা দিয়ে কিছু করো, এ পথ ছেড়ে দাও।"

মানুষ কেন এত ভালো হয়! একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে নান আর গিলা-কলিজা খেয়ে সোজা চলে গেল তেজগাঁও রেল লাইলসংলগ্ন বস্তিতে। সেখানে ওর মায়ের দূরসম্পর্কের এক বোন থাকে, নার্গিস খালা। নার্গিস খালা রেললাইনের পাশে বসে বাবা, গাঁজা আর পাতা বিক্রি করে। পাতা মানে হেরোইন। খালা জানাল, তার কাছে থাকতে হলে এসবই করতে হবে। খালা মাল দেবে, আমেনাকে বেচতে হবে। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না আমেনার। বেঁচে থাকতে হলে এ ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ওর? মাস দুই পর যখন নাইমের অস্তিত্ব টের পেল, তখন খালাকে বলল এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমেনার। অনেক মারত বলে ছেড়ে চলে এসেছে। মারের প্রমাণ হিসেবে দৌলদিয়ার পল্লির 'যূথীর মা' খালার মারের

দাগগুলো দেখিয়ে দিল। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল, নাইমের জন্ম হলো। বিপত্তিটা বাঁধল যখন নার্গিস খালা আর তার কথিত স্বামী হাতকাটা আফজাল পুলিশের কাছে ধরা পড়ল। আফজাল মারা গেল কথিত বন্দুকযুদ্ধে আর নার্গিস খালার হলো তিন বছরের জেল। আমেনার মাদক ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। নাইমকে নিয়ে বেঁচে থাকতে আবার আগের পেশায় নামতে হলো আমেনাকে। কখনো ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপর, কখনোবা সংসদ ভাবনের সামনে দাঁড়িয়ে যা আয় হচ্ছিল, তা দিয়ে বছর দুই মা-ছেলের চলে যাচ্ছিল। চূড়ান্ত বিপত্তিটা হলো যখন সরকার রেললাইনের দুই পাশের বস্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এখন কী করবে আমেনা? কোথায় যাবে? ছেলের বয়স চার। এত বড় ছেলে থাকতে ঘরে খদ্দের ওঠানোটাও মুশকিল। শুরু করল বাসায় বাসায় কাজ করা। সব বাড়ির সাহেবরা ওর সঙ্গে শুইতে চায়। আমেনাও শুইতে রাজি, কিন্তু তারা শুইতে চায় মাগনা। কেউ টাকা দিতে চায় না। তারপর বাসাবাড়ির কাজ ছেড়ে কাজ নিল মেসে। গায়ের রং ফরসা আর শরীরে মাংস থাকায় সেখানেও সবাই শুইতে চায়। তবে তারা অল্প কিছু হলেও টাকাপয়সা দিত। আরও বড় হতে থাকে নাইম। যখন নাইমের বয়স ছয়, তখন একদিন সে ওয়াজে শুনল যার সন্তান কোরআনের হাফেজ, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম হয়ে যায়। একজন হাফেজ মোট পঞ্চাশজনকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। তখনই আমেনা সিদ্ধান্ত নেয়, সে ছেলেকে হাফেজি পড়াবে। ভর্তি করায় ঢাকার একটি হাফেজি মাদরাসায়। সেখান থেকে দিন পনেরো পর পালিয়ে এসে বলল সে আর মাদরাসায় যাবে না। এভাবে একে একে তিনটা মাদরাসা থেকে চলে এল। শেষে আমেনা সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামে যাবে সে। তারপরচলে এল গ্রামের বাড়ি। নানাজনের নানা কথা সহ্য করে গ্রামে এসে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করে। এনজিও থেকে সামান্য লোন নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁস-মুরগির পাশাপাশি মাছ আর ছাগল চাষও শুরু করে। তারপর ছেলেকে ভর্তি করায় নওশাদ চৌধুরীর কওমি মাদরাসায়। নাইম যেভাবেই জন্ম নিক না কেন, দেখতে হয়েছে খুবই সুন্দর, সুশ্রী। টকটকে গায়ের রং, উন্নত স্বাস্থ্য। যখন আমেনা ছেলেকে মাদরাসায় ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে মেসের কাজ ছেড়ে গ্রামে যাবে বলে মেসে জানিয়েছিল, তখন এক ফালতু ছ্যামরা বলেছিল এত সুন্দর ছেলেটাকে মাদরাসায় পড়াবেন, সেখানকার হাফেজ-মাওলানারাতো ছেলেটার সঙ্গে আকাম-কুকাম করবে। মারাত্মক ফাজিল ছ্যামরা। নামাজ-রোজা তো কখনোই করত না, আরও ধর্ম নিয়া আজেবাজে কথা বলত। অবশ্য ওই ছ্যামরা ওর সঙ্গে কোনো দিনও খারাপ কিছু করতে চায়নি। আর যারা করেছে, তারা অবশ্য প্রত্যেক শুক্রবার পাঞ্জাবি পরে মাথায় টুপি দিয়ে বগলে জায়নামাজ নিয়ে জুমা পড়তে যেত। কিন্তু যত যা-ই হোক, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা কোরআনের হাফেজদের নিয়ে এমন নোংরা কথা বলার কারণে সে যে আসার সময় নাইমকে এক হাজার টাকা দিয়েছিল, তা-ও নেয়নি আমেনা।

কিন্তু আমেনা কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না নাইম কেন মাদরাসায় টিকতে চায় না। প্রতি বৃহস্পতিবার মাদরাসা থেকে ফিরে মন খারাপ করে বসে থাকে আর বলে মাদরাসায় আর যাবে না।

ছেলে বাড়িতে আসা উপলক্ষে সাধ্যমতো ভালো-মন্দ রান্না করার চেষ্টা করে আমেনা। ছেলেকে আদর করে খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, 'আমি যদি মরে যাই, তাহলে তোর ভালো লাগবে?' একথা শুনে মাকে জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিল নাইম। ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'তাইলে তুই আমারে ক, তুই ক্যান মাদরাসায় যাইতে চাইসনা। এই দুই বছরে তোরে চাইর-চাইরটা মাদরাসায় ভর্তি করছি। তুই কুনু মাদরাসায় থাকতে চাইস না ক্যান, আমারে ক। যদি না কইস, তাইলে আমি গলায় দড়ি দিমু'। এ কথা শোনার পর নাইমের কান্নার গতি আরও বেড়ে গেল। বাঁধভাঙা কান্না। হিক্কা দিতে দিতে বলল খাওয়ার পর বলবে সে। রাতে শোয়ার পর নাইম আমেনাকে যা বলল, তা আমেনা কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না। এমনকি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে না। বুঝতে পারল ছেলে মাদরাসায় পড়বে না, এই কারণেই এমন কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে। মাদরাসার হাফেজ-মাওলানারা আমেনার কাছে সব সময়ই ফেরেশতাতুল্য। তাদের সম্পর্কে এমন নোংরা কথা নাইম বলে কী করে? আমেনা সিদ্ধান্ত নিল, এবার সে নিজে গিয়ে ছেলেকে মাদরাসায় দিয়ে আসবে। এই ছেলেকে নিশ্চয়ই বদ জিনে ধরছে। সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তানের হাত আছে এর পেছনে। ছেলেকে মাদরাসায় দিয়ে আসবে আর বলবে ছেলেকে যেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। আমেনা শুনেছে অনেক ছাত্রকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। নাইমকেও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত বলে মনে হলো আমেনার। আর না হলে এই বদজিন ছাড়ানো যাবে না। কোরআনের হাফেজ হওয়া এত সহজ না। সে ছেলেকে কোরআনের হাফেজ বানাতে চায় জেনেই ইবলিশ আক্রমণ করেছে। যে করেই হোক, এই শয়তানের হাত থেকে নাইমকে বাঁচাতে হবে। আমেনার জীবনে আর কোনো আশা নেই, নেই কোনো স্বপ্ন। স্বপ্ন শুধু একটাই, সে ছেলেকে হাফেজ বানাবে। তা যে করেই হোক। তাতে যদি ছেলের একটু কষ্ট হয় হবে। আমেনা বোরকা পরে তার ওপর বড় একটা বড়সড় চওড়া ওড়না চাপিয়ে ছেলেকে নিয়ে রওনা দিল মাদরাসায়। এসে খুঁজে বের করল হাফেজ মাওলানা কবীর হুজুরকে। জিনের ওপর তার দখল এলাকা বিখ্যাত। সেই পারবে নাইমকে জিনমুক্ত করতে। এই বদ জিন ছাড়াতেই হবে, তা যে করেই হোক। নাহলে এই জিন ছেলেকে হাফেজ হতে দেবে না। সে কবীর হুজুরকে যতদূর সম্ভব বিষয়টি খুলে বলল। তারপর অতি কষ্টে জমানো দুই হাজার টাকা কবীর হুজুরের হাতে দিল জিন তাড়ানোর হাদিয়া হিসেবে হুজুর যেন নাইমের ওপর থেকে বদজিনের আসর কাটিয়ে একজন প্রকৃত হাফেজ বানিয়ে দেয়। আরও বলে এল কবীর হুজুর যেন নাইমকে তার খাস খেদমতদার বানিয়ে নেয়। দরকার হলে এমন হাদিয়া আমেনা আরও দেবে। সেই দিনই নাইমের পায়ে শিকল লাগল। কবীর মাওলানা নতুন খাদেম পাওয়ায় টগরের ওপর থেকে একটু চাপ কমল।

একদিন আসরের নামাজের পর মুহতামিমের মোবাইলে অপরিচিত একটা নাম্বার থেকে ফোন এল। ফোন ধরে সে সালাম দেওয়ার আগে ওপাশ থেকে সুললিত কণ্ঠে সহিহ্ শুদ্ধভাবে সালাম দিল একটি পুরুষ কণ্ঠ। সালামের জবাব দিয়ে মুহতামিম জানতে চাইল কে। ওপাশ থেকে বলল, 'বড় হুজুর, আমি বদি, বদিউজ্জামান'। নামটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে একটা ভিন্নরকম শিহরণ খেলে গেল মুহতামিমের শরীরজুড়ে। তার কান মোবারক গরম হয়ে গেল, নিম্নাঙ্গ মোবারক শক্ত হতে শুরু করল, পায়ুপথ মোবারক কেমন কেমন করতে লাগল। বদিউজ্জামান তার এক পুরাতন ছাত্র। এখন থেকে বারো বছর আগে সে এখানে পড়ত। আহা রে বদিউজ্জামান! তাকে নিয়ে কত স্মৃতি! কত কত ভাবনা রয়েছে, তা শুধু মুহতামিম একাই জানত না, অনেকেই জানত। বদি যখন এখানে পড়ত, তখন তার বয়স ১৫-১৬। টকটকে ফরসা, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, লাল দুটো ঠোঁট। সবচেয়ে চমৎকার ছিল ওর ঢলঢলে নিতম্বখানা। ভরাট স্বাস্থ্যের বদি যখন মুহতামিমের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত, তখন সে গরম হয়ে যেত। বদি পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিল না। মুহতামিমের দিকে তাকিয়ে সব সময় কেমন একটু মুচকি হাসত। ভবিষ্যতে প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা আছে, এমন ছেলেমেয়ে একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে যেমন করে হাসে, বদিও তেমনি করে হাসত। বদিকে প্রথম যেদিন তার খেদমতে ডেকেছিল, সেদিনই মুহতামিম বুঝেছিল এ পাকা খেলোয়াড়। বদি নিজেই উঠে যেত মুহতামিমের ওপর। প্রথম দিন মুহতামিমের হয়ে যাওয়ার পর বদি মুহতামিমের কান মোবারকে আলতো করে কামড় দিয়ে বলেছিল, 'আমি একটু করব'। শুনে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল মুহতামিম। কতদিন নেয় না! তার নিজের মাদরাসা ছেড়ে আসার পর ওভাবে আরাম করে কখনো নিতে পারেনি। সেদিন উপুড় হয়ে, চিত হয়ে, কাত হয়ে, দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনকে খেদমত করেছিল। মুহতামিমের মনে হতো একে-অন্যের জামাই-বউ। এরপর থেকে মুহতামিম অন্য শিশুদের খেদমত নিলে বদি কান্নাকাটি পর্যন্ত করত। আবার বদিউজ্জামান অন্য কোনো ছাত্রের পাশ ঘেঁষে বসলেও মুহতামিমের কলিজার মধ্যে খোঁচা লাগত। এমন সঙ্গী মুহতামিম সারা জীবনেও পায়নি। বদিউজ্জামান হাত কেটে মুহতামিমের নামের অদ্যক্ষর লিখল। দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিল, এ জীবনে কেউ আর অন্য কোনো পুরুষের দিকে তাকাবে না। কিন্তু বিষয়টি একসময় মাদরাসার ছাত্ররা টের পেয়ে গেল। তারা বদিউজ্জামানকে ঠারেঠোরে নানা কথা বললেও মুহতামিমকে কারও কিছু বলার সাহস ছিল না। বড় হুজুর বলে কথা। তারা আড়ালে-আবডালে ওদের স্বামী-স্ত্রী বলা শুরু করল। ওয়াদা ভঙ্গ করে নিজাম নামের এক কিশোরের প্রতি ঝুঁকে পড়ে মুহতামিম। একদিন স্বয়ং বদিউজ্জামানের হাতে ধরা পড়ে যায় দুজন। আর সেটাই কাল হলো। তিনদিন পর্যন্ত ভাত খেলো না বদি। সে কী অভিমান! সেই অভিমান রূপ নিল জিঘাংসায়। নিজামের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-মারামারি লাগত বদির। আল্লাহ্‌র

জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদি ওস্তাদের কাছে অনেকের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিত বদিও। খালি হাতে মল্লযুদ্ধ, ছুরি-চাপাতি চালানোয় সে ছিল ওস্তাদদের সমকক্ষ। সেই বিদ্যা একদিন প্রয়োগ করল নিজামের ওপর। এক গরমের রাতে মাদরাসার বারান্দায় ঘুমন্ত নিজামকে জবাই করে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় বদি। বাইরের সবাই বলতে লাগল দুই ছাত্রের দ্বন্দ্ব থেকে এই খুন। কিন্তু মাদরাসার অনেকে বিষয়টি আন্দাজ করতে পারলেও বাইরে কাউকে কিছু বলেনি কেউ। বদি যে গেল আর কোনো খোঁজ পেল না পুলিশ। আজ এক যুগ পর ফোন করল মুহতামিমকে। ফোনটা নিয়ে একটু দূরে গেল মুহতামিম, 'বদিউজ্জামান! আমার ময়না পাখি, আমার কুটকুটি সোনা, এত বছর পর! কোথায় তুমি? কেমন আছ?' দীর্ঘ এক ঘণ্টা কথা হলো দুজনের। সবকিছু জানাল সে মুহতামিমকে। তবে কিছু রেখে কিছু ঢেকে। বদি ছিল মিথ্যার রাজা। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা ও অভিনয়ে পারদর্শী বদি তার ধূর্ততাকে কাজে লাগাল। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে একটি মসজিদে গিয়ে বলল সে একজন নওমুসলিম। মুসলমান হওয়ার পর তার পরিবার তাকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে। ব্যস, আকাশের চাঁদ পেল তারা। সুন্দর চেহারা আর নওমুসলিম পরিচয় দেওয়ার কারণে তার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাল অনেকেই। কেউ কেউ তাকে সন্তান হিসেবে লালন-পালন করতে চাইল। হলোও তাই। বদিকে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে একজন খাঁটি দ্বীনদার ইসলামের সেবক বানানোটা হয়ে উঠল তাদের ইমানি দায়িত্ব। বদিকে ভর্তি করিয়ে দিল একটি হাফেজি মাদরাসায়। সেখান থেকে বদি হেফজ শেষ করেছে। এরপর একে একে দাওরায়ে হাদিস পাস করে শেষতক হয়েছে মুফতি। শেষে চাকরিও হলো একটি কওমি মাদরাসায়। কিন্তু কথায় বলে না, খাসলত যায়না ধুইলে, ইল্লত যায়না মইলে। বদি সেখানে এক ছাত্রকে ধর্ষণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল। এলাকাবাসী তাকে ধরে দিল গণপিটুনি। ছেঁড়া জুতার মালা গলায় দিয়ে বের করে দিল এলাকা থেকে। সে গিয়ে ঠাঁই নিল কক্সবাজারে এক সহপাঠীর কাছে। সে-ও একটি মাদরাসার শিক্ষক। কিন্তু বদিকে শিক্ষক হিসেবে চাকরি আর দিতে পারল না। সেই বন্ধুর কাছেই খোঁজ পায় ইয়াবা ব্যবসার। একটু ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা হলেও এখানে একেবারেই কাঁচা টাকা বুঝতে পারল বদি। মাদরাসায় নিয়মিত পায়ুচর্চার ফলে সহজগম্য পায়ুপথ সে কাজে লাগাল ইয়াবা পাচারের কাজে। কিন্তু বদি এখন আবার ফিরতে চায় মুহতামিমের কাছে, তার পুরোনো মাদরাসায়। বদি মুহতামিমকে অভয় দিয়ে বলে তাকে দেখলে আর কেউ চিনতে পারবে না। আর বদির নামও এখন আর বদি নেই। পাঁচলাইশের মসজিদ থেকে তার নাম হয় মোহাম্মদ ওমর আলী। অর্থাৎ সে এখন হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওমর আলী।

সেইদিন বাদ মাগরিব নওশাদ চৌধুরীকে মুহতামিম জানাল, দিন দিন হাদিসখানার ছাত্রের পরিমাণ বাড়ছে। এখন একজন মুফতি নিয়োগ না দিলেই নয়। আর মুফতি নিয়োগ দিলে আরও নতুন ছাত্র পাওয়া যাবে। নতুন ছাত্র মানে আয়ের নতুন উৎস। সম্মতি দিল নওশাদ চৌধুরী। তবে এখনই খুব একটা বেতন দিতে পারবে না। কম বেতনে কোনো মুফতি আছে কিনা, জানতে চায় নওশাদ চৌধুরী। তাকে অভয় দেয় মুহতামিম। সে রাজি থাকলে অল্প বেতনে ভালো মুফতি সে জোগাড় করে ফেলবে। নওশাদ চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

বের হয়েই বদিউজ্জামান ওরফে মোহাম্মদ ওমর আলীকে ফোন করল মুহতামিম। জানাল, সে চাইলে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। এদিকে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে মুহতামিম। সবকিছু গোছগাছ করতে তিন-চারদিন সময় লাগবে বদির। এরপরই রওনা দেবে বলে মুহতামিমকে জানাল সে। কিন্তু মুহতামিমের যেন আর তর সইছিল না। গুহ্যদ্বার মোবারক যেন কেমন কেমন করছিল। পরদিন হাদিসখানায় জানিয়ে দিল, তাদের জন্য একজন অত্যন্ত ভালো মানের মুফতি ওস্তাদ আসছে।

◆ ২৪ ◆

দিন চারেক পর বদি জানাল, তার যা গোছানোর ছিল, তা গোছানো হয়ে গেছে। আগামীকাল সে রওনা দেবে। তার সঙ্গে ভারী ভারী বেশ কয়েকটি ব্যাগ থাকবে। মুহতামিম যেন কয়েকজন ছাত্রসহ বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকে। মুহতামিম তাকে এসব নিয়ে চিন্তা না করতে বলেদিল। সে অবশ্যই থাকবে এবং তাকে নিয়ে আসবে। পাঁচ দিন পর ঢাকা থেকে আসা বাসটি থেকে যে নামল, তাকে দেখে সবাই বেশ চমকে গেল। প্রায় ছয়ফুট লম্বা, অত্যন্ত বলশালী এক ত্রিশের কোঠার মস্ত মাওলানা, যার বুক পর্যন্ত একটু কোঁকড়ানো ঘন কৃষ্ণ দাড়ি মোবারক, ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল, টাকনু অবধি ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, যাতে লাগানো আছে সোনালি বোতাম, মাথার পাগড়ি নেমে গেছে পিঠ পর্যন্ত। দুধে আলাতা গায়ের বরণ তার। গা থেকে আসছে অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ। সে দেখতে সৌদির যেকোনো প্রিন্সের চেয়ে সুন্দর। তার রাজসিক প্রবেশে চমকে গেল পুরো এলাকা। আর কেউ চিনতে না পারলেও বদিকে চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি মুহতামিমের। সেই হাসি, সেই ঠোঁট!
বারো বছর পর সে পা রাখল তার পুরোনো মাদরাসায়। এই বারো বছরে তার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মাদরাসারও। মুহতামিমের ঘরের পাশেই তার জন্য স্পেশাল ঘর ঠিক করে রেখেছে মুহতামিম। সেই সঙ্গে ঠিক করে রেখেছে চার-চারজন খাদেম, যাদের সবার বয়স বারোর মধ্যে। এই হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওমর আলীকে দেখে কারোরই বোঝার উপায় নেই এই সেই বদি, যে তার ওস্তাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের জের ধরে একজনকে জবাই করে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলেছিল। তার কথায় চিটগংয়ের টান অত্যন্ত স্পষ্ট। দুপুরে তার জন্য স্পেশাল খানাপিনার আয়োজন ছিল নওশাদ চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানে দাওয়াত ছিল কমিটির অন্য সদস্যদেরও। খাওয়াদাওয়া শেষে বেশ কিছু সময় ধরে আলাপ-পরিচয় হলো কমিটির সবার সঙ্গে। বদির আচার-আচরণে সবাই বেশ মুগ্ধ। সবাই জানল, বদির বাড়ি চট্টগ্রামে। এরপর ফিরে এল মাদরাসায়। এসেই মুহতামিমের রুমে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দিল। এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন অন্যজনের ওপর। বেশ কিছু সময় শুধু চকাস চকাস শব্দই আসতে থাকল। তারপর চাটাচাটি, চোষাচুষি আর কামড়াকামড়িতে অন্ধকার। দুজনেই যেন দুজনের জন্য তৃষিত কাকের ন্যায় অপেক্ষায় ছিল। ওমর আলী যেন আগের চেয়ে একটু বেশিই আনন্দ দিল মুহতামিমকে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর একজন অন্যজনকে জড়িয়ে থাকল বেশ কিছু সময়। এরপর বাথরুমে গিয়ে দুজন একসঙ্গে ফরজ গোসল সারল। তারপর পাশাপাশি শুয়ে দুজন অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলল। মাদরাসায় ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা অনেক কিছু। সব শেষে বলল নওশাদ চৌধুরী মাহফিলের টাকা নিয়ে সবারসঙ্গে কী প্রতারণাটা করেছে। সে কথা শোনার সঙ্গেসঙ্গে শোয়া থেকে উঠে বসে বদিউজ্জামান ওরফে ওমর আলী বলল,

'ওস্তাদ, আপনার জন্য কিছু উপহার আনছি'। ওস্তাদ বলার সঙ্গে সঙ্গে মুহতামিম ওমর আলীর মুখ চেপে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে সবার সামনে ওস্তাদ ডাকবা না। তুমি আমার ছাত্র তা তো আর এখানকার কেউ জানে না'।
ওমর আলী তার রুম থেকে দুটি ভারী ভারী ব্যাগ নিয়ে এল। দেখে মুহতামিম বলল, 'এই দুইটা ব্যাগ ভরা আমার জন্য উপহার?' জবাবে ওমর আলী বলল, 'দেখতে থাকেন খালি'। প্রথম ব্যাগটা খুলে ওমর আলী একের পর এক ভারী ভারী বিশাল সাইজের কোরআন শরিফ বের করতে থাকল। দেখে মুহতামিম বলল, এতগুলো কোরআন মজিদ কেন?
– বলছি না দেখতে থাকেন খালি।
দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে বের করতে থাকল ভারী ভারী সিয়াহ্ সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থ। তারপর মুহতামিমকে বলল, 'একটা কোরআন মজিদ খোলেন'।
মুহতামিম একটা কোরআন হাতে নিয়ে প্রথম কয়েকটি পাতা ওলটাতেই দেখল একটা গর্তের মতো। তার মধ্যে পলিথিন দিয়ে প্যাঁচানো লাল রঙের প্যাকেট বা এমন কিছু একটা। মুহতামিমের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে বলল, 'এগুলো কী, বদি?' বদিসঙ্গেসঙ্গে মুহতামিমের মুখ চেপে ধরে বলল, 'বদি না, হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওমর আলী'। এবার বদি নিজেই সব কোরআন খুলে রাখল মুহতামিমের সামনে। সব কটিরই একই অবস্থা। এরপর খোলা শুরু করল হাদিসগুলো। সেখানেও একই ঘটনা। মুহতামিম আবার অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী এইগুলা?'
– এইগুলা সব টাকা, কাঁচা টাকা।
– টাকা মানে?
– টাকা মানে ইয়াবার নাম শোনেন নাই? এইগুলা সেই ইয়াবা।
সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বড় জিব বের করল মুহতামিম।
– কও কী? কই পাইছ এসব?
– সেসব অনেক গল্প, অনেক কথা। ব্যবসার কথা বলছিলাম না আপনারে? এই সেই ব্যবসা। এখানে খালি টাকা আর টাকা। অমন নওশাদ চৌধুরীকে গোলাম বানায়া রাখব, ইনশাআল্লা।
– বুঝলাম, কিন্তু তুমি এইগুলা কই পাইছ?
– সেই সব জাইনা আপনে কী করবেন? শুধু আমারে কন, এই এলাকার পোলাপান কী পরিমাণ ইয়াবা খায়? কে কে বেচে?
– আরে, মনে হয় ভাতের চাইতে বেশি খায়। বাচ্চা পোলাপান হইতে শুরু কইরা বুড়ারা পর্যন্ত খায়।
– বেচে কে, চিনেন?
– অনেকেই বেচে, কয়েকজনরে তো চিনি।
– খুচরা দুই-চাইর-পাঁচটা যারা বেচে, তারা না। মূল ডিলার কেডা,জানেন?
– মনে হয় চিনি একজনরে। কিন্তু এইগুলা তো মারাত্মক ভয়ংকর জিনিস, বদি।
– আবার বদি! ওমর আলী।
– ও, ওমর আলী। এইগুলা বেচলে তো ক্রসফায়ার দেয়।

– দেয় তো আমিও জানি। কিন্তু সবাইরে তো আর দেয় না। দিলে তো আর এই ব্যবসা চলত না। খুচরামুচরা যারা দুই-চাইর-পাঁচশো বেচে, তাগোরে দেয়। এইখানে কত পিস মাল আছে, আপনার কোনো ধারণা আছে? প্রতিটা কোরআন শরিফের মধ্যে আছে বিশ হাজার কইরা। দশ পিস কোরআনের মধ্যে আছে দুই লাখ। আর হাদিসের মধ্যে আছে বিশ হাজার কইরা। মোট চাইর লাখ বাবা আছে আমার কাছে।

– কও কী! আমার তো মাথা ঘুরতাছে!

– মাথা আরও ঘুরবে। এবার শোনেন এতে লাভ কত। আমি যদি উখিয়া থিক্যা আনি আর এইহানে পাইকারিও বেচি, তাইলে প্রতি পিস বাবায় আমার কম কইরা এক থাইকা দেড়শো টাকা লাভ থাকব। তাইলে চার লাখ পিস বাবায় আমার কী পরিমাণ লাভ আইব, একবার ভাবেন।

এবার টাকার হিসাব করতে গিয়ে মুহতামিমের মাথা সত্যি সত্যি ঘুরতে লাগল। সে টেবিলে রাখা জগ থেকে পানি ঢেলে খেলো এক গ্লাস। বলে কী এসব? এ তো কোটি কোটি টাকার হিসাব! সবকিছু দেখে মুহতামিমের ভিমরি খাওয়ার জোগাড়। সে থতমত খেয়ে বলল, 'আগে বলো এইগুলা তুমি কই পাইছ? এইগুলা কেনার টাকা তোমারে কে দিল?'

– এক ডিলারের কাছ থাইকা বাকিতে আনছি। বেইচা বেইচা টাকা দিতে হবে।

বদি কক্সবাজারের মাদরাসার শিক্ষক বন্ধুর সঙ্গেই ইয়াবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। তবে নিজে টাকা খাটিয়ে কখনো ব্যবসা করেনি। সে সব সময় কাজ করেছে ক্যারিয়ার হিসেবে। একজন ভালো ক্যারিয়ারিস্ট হতে তাকে সহায়তা করেছে তার ভালো চেহারা, ইসলামি পোশাক আর সহজগম্য পায়ুপথ। ছোটবেলা থেকে বাই সেক্সুয়াল বদির পায়ুপথ ছিল সহজগম্য। সেখানে সে প্রথম থেকে দুই-চার হাজার, পরে আরও বেশি করে ইয়াবা বহন করতে শুরু করে। কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ, হ্নীলাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ইয়াবা পায়ুপথে করে ঢাকায় পৌঁছে দিত। অমন সুন্দর চেহারা দেখে কেউ সন্দেহ করত না। ধীরে ধীরে সে বিশ্বস্ততা অর্জন করে। এই ক্যারিয়ারের কাজ করে যা আয় হতো, তা দিয়ে মন ভরছিল না তার। কিন্তু নিজে শুরু করার মতো সাহস থাকলেও পুঁজি ছিল না। ধীরে ধীরে সাহস বাড়তে থাকল বদির। পায়ুপথ ছাড়াও অন্যান্যভাবে সে পাচার করা শুরু করল।

এবারের চালানটা ছিল সবচেয়ে বড়। পাঁচ লাখের চালান। এই চালানের বিষয়ে যখন কথা শুরু হয়, তখন থেকেই ভাবতে থাকে এবার একটা ঝুঁকি নেবে বদি। পল্টি মারবে সে। কিন্তু পল্টি মেরে কোথায় লুকাবে? তার দরকার একটা নিরাপদ আশ্রয়, দরকার বিক্রি করার জায়গা। তখনই মাথায় আসে মুহতামিমের কথা। জানত মুহতামিম রাজি হবেই। পার্টি শুরু থেকেই বলেছে, এবার মাল নিয়ে ঢাকায় যাবে দুজন। একজন রোহিঙ্গা আর বদি। তখন বদি পল্টি মারার পরিকল্পনাটা আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নিল। পরিকল্পনা মাফিক কক্সবাজার থেকে রওনা দেয় দুজন। রোহিঙ্গা নুর সায়িদকে বসায় বাসের একেবারে সামনের দিকে আর ও নিজে বসে পেছনের দিকে। ওর ভাবনা একটাই, জীবনে বড় হতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। না হলে বড় হওয়া যাবে না। দরকার হলে এই চালান মেরে দিয়ে এই লাইন ছেড়ে দেবে সে। হয় সে মারবে, না হলে মরবে। নুর সায়িদের পায়ুপথেও বেশ কিছু ইয়াবা রয়েছে

কনডমে ঢোকানো, তাই তার বাস থেকে নামা নিষেধ। সে সারা পথে কিছু খাবে না। ঢাকায় নেমে মাল খালাস করে তারপর যত ইচ্ছা খাবে। কিন্তু ওমর আলী জানে, দরিদ্র রোহিঙ্গা যুবকের অবশ্যই ক্ষুধা লাগবে। যাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য কুমিল্লায় যখন বাস থামল, তখন নিজে খেয়ে নুর সায়িদের জন্য দুটি গরম পরোটা আর গরুর মাংস রোল করে নিয়ে জানালা দিয়ে হাতে দিল। রাতের অন্ধকারে বিষয়টি খেয়াল করল না কেউ। আর বাসের যে পাশে নুর সায়িদ রয়েছে, সেপাশে কোনো সিসি ক্যামেরাও নেই। সেই গরুর মাংস আর পরোটা নুর সায়িদের হাতে দিল, সেখানে ভালো করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল বদি। বাস কুমিল্লা ছাড়ার অল্প কিছু পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নুর সায়িদ। পরদিন পত্রিকায় আসে পায়ুপথে ইয়াবা পাচারের সময় পেটের মধ্যে কনডম ফেটে গিয়ে যুবকের মৃত্যু। নিজের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করে ওমর আলী চলে আসে তার পুরোনো মাদরাসায়। এখন তার সঙ্গে থাকা ইয়াবা যে টাকায়ই বিক্রি করুক না কেন, পুরোটাই তার লাভ। এখন ধীরেসুস্থে আগাতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না।

মুহতামিমের যখন ধীরে ধীরে এলাকায় প্রভাব বাড়তে থাকে, তখন থেকে নওশাদ চৌধুরী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে। আগেও যে সে খুব একটা ভালো ব্যবহার করত, এমন নয়। তবে তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। আর সেই কারণেই মুহতামিমও গফ্ফার পাটোয়ারীর সাথে সম্পর্ক ভালো করতে থাকে। নওশাদ চৌধুরী আর গফ্ফার পাটোয়ারী একই মাদরাসার কমিটির লোক হলেও দুজনের মধ্যে সম্পর্ক সাপে-নেউলে। নওশাদ চৌধুরী যখন শেষবার নির্বাচনে হেরে যায়, তখন তার প্রতিপক্ষের হয়ে কাজ করেছিল গফ্ফার পাটোয়ারী। এরপর সে ঘোষণা দেয়, পরেরবার সে নিজেই নির্বাচন করবে। আর নওশাদ চৌধুরী ঘোষণা দেয় সে এমপি নির্বাচন করবে। দুজনের মধ্যকার এই দা-কুমড়া সম্পর্কটাকে এবার কাজে লাগাতে চায় মুহতামিম আর বদিউজ্জামান। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

◆ ২৫ ◆

দুপুরের দিকে জোহরের নামাজের কিছু আগে মাদরাসায় প্রায়ই বিচার বসে। আজও বসেছে। হাদিসখানার দুজন সিনিয়র ছাত্র, হেফজ বিভাগের তিনজন, নুরানি বিভাগের দুজন। সিনিয়র ছাত্রদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে, আর যাদের সাইজ ছোট, ওজনে কম, তাদের পায়ে দড়ি লাগিয়ে ছাদের সিলিংয়ের সঙ্গে ঝোলানো হয়েছে। বড়দের অপরাধ, তারা 'আউটবই' পড়েছে একজন, একজন রবীন্দ্রসংগীত শুনেছে মোবাইলে, হেফজ বিভাগের তিনজন একসঙ্গে বাইরে গিয়ে সিনেমা দেখেছে, নুরানি বিভাগের একজন ছবি আঁকার মতো মারাত্মক অন্যায় করেছে, একজন বাইরে গিয়ে ক্রিকেট খেলেছে। শাস্তিদানের জন্য বরাবরের মতো আছে সবচেয়ে শক্তিশালী খতরনাক শিক্ষক জিন হুজুর খ্যাত হাফেজ মাওলানা কবীর হোসেন, যাকে ছাত্ররা লুকিয়ে লুতি কওমের রাজা বলেও ডাকে, আবার আজরাইল হুজুর বলেও ডাকে। কথিত আছে, যারা এই মাদরাসায় একবার পা রেখেছে, তাদের একবার না একবার ধর্ষণ করেছে সে। শারীরিক শাস্তির আগে তাদের বয়ান দিচ্ছে মাদরাসার বড় হুজুর ওরফে মুহতামিম হুজুর। কোরআন-হাদিসের কোথায় কোথায় গান শোনার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে, বিধর্মী কাফের মালাউন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শোনা কত পাপ, ছবি আঁকলে মৃত্যুর পর এর শাস্তি কী, তার বর্ণনা করছে। সিনেমা দেখা এতটাই পাপ যে এই দেশে শরিয়াহ আইন থাকলে তাদের হয়তো কতলই করা হতো। আর যে শিশুটি ছবি এঁকেছে, সে তো কেয়ামতের পর লক্ষকোটি বছর পৃথিবীর চেয়ে সত্তর গুণ বেশি তাপযুক্ত আগুনে জ্বলবে। এরা সবাই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে। আর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কতল, যা সহিহ্ হাদিসে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা আছে। কিন্তু তাদের বয়স কম আর দেশেও যেহেতু এই মুহূর্তে শরিয়াহ আইন নেই, তাই তারা বেঁচে গেল। তাছাড়া ভবিষ্যতে এরা হাফেজ-আলেম হবে, আল্লার জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে, তাই এখন শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের শুদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ দিচ্ছে ওস্তাদেরা। শাস্তি দেওয়ার পর প্রত্যেককে আবার কলেমা পড়ে প্রথমে মুসলমান হতে হবে, তারপর তওবা করতে হবে। নাহলে ইহকাল-পরকাল কোথাও মুক্তি নেই এদের। তাদের শাস্তির জন্য বেত নয়, মেহগনি গাছের মোটা মোটা ডাল কেটে আনা হয়েছে। মেহগনি গাছের ডাল এই কারণে যে এই ডাল সহজে ভাঙে না। সকল বয়ান শেষে মুহতামিম নির্ধারণ করে দিল সবাইকে ৪১টি করে বাড়ি দিয়ে শুদ্ধ করা হবে। উল্টো করে ঝোলানো হয়েছে তিনজনকে। যাদের আকার-আকৃতিবড় বলে ঝোলানো যায়নি, তাদের দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। লুতি কওমের রাজা মেহগনির ডাল মোবারক দিয়ে এককেটা বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী চিৎকারে ফেটে পড়ছে মুরতাদরা। আর সেই চিৎকার শুনে কেঁদে দিচ্ছে অপেক্ষমাণ মুরতাদরা। মুহতামিম হুকুম দিল, 'সব বাড়ি দিবা পুটকি বরাবর, যাতে কাউরে দেহাইতে না পারে। ফাইজলামি পাইছ?' মেহগনির ডাল পেরে উঠছে

না হাফেজ কবীর মাওলানা ওরফে জিন হুজুর ওরফে আজরাইল হুজুরওরফে লুতি কওমের রাজার সঙ্গে। দশ-বারোটা পিটান দেওয়ার পর লাঠি ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে সমস্যা নেই। পাশেই স্তূপ করা আছে ডাল। একটা ভেঙে যাওয়ার পর আরেকটা তুলে নিচ্ছে সে। একসময় হাঁপিয়ে উঠল সে। তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম ফেলে দিয়ে আবার শুরু করেছে নতুন উদ্যমে। এভাবে চলল ঘণ্টাখানেক। আসরের আগেই প্রত্যেকের শরীরে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর চলে এল। মুহতামিম হুকুম করল, এদের কাউকে যেন কোনো প্রকার ওষুধ খেতে দেওয়া না হয়। কারণ, জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ। জ্বর হলে বরং ভালো, তাতে এই ভয়ংকর অপরাধীদের পাপ কিছুটা কাটা যাবে। যে ওদের ইহুদি-নাসারাগো ওষুধ খেতে দেবে, তারও একই পরিণতি হবে।

মোটামুটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে সবার জ্বর সেরে গেলেও জ্বর ভালো হয়নি নুরানি বিভাগের ছাত্র আবীরের, যাকে টানিয়ে পিটানো হয়েছিল ছবি আঁকার অপরাধে। তার সারা শরীর ফুলে গেছে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা শুরু করেছে। ওর বয়স এগারো। এই আবীরের ওপর ভিন্ন রকম খায়েশ ছিল হাফেজ মাওলানা মোক্তার হোসেনের। কিন্তু আবীর মুহতামিমের 'ইশপিশাল' খাদেম ছিল বলে এত দিন কিছু বলতে পারেনি সে। আবীরের অসুস্থতা মারাত্মক পর্যায়ে যাওয়ার পর তাকে আলাদা একটা ঘরে রাখা হয়েছে। দশম দিনে হাফেজ মোক্তার হোসেন মাওলানা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কোনো রকম বাঁধাবিপত্তি ছাড়াই চুপিসারে গিয়ে কাজটা সেরে এল। পরপর দুইবার ধর্ষণ করে নিল মৃত্যুপথযাত্রী এগারো বছরের শিশু আবীরকে। সকালে মাদরাসা থেকে আবীরের মাকে খবর দেওয়া হলো আবীরের জ্বর এসেছে, তারা যেন আবীরকে নিয়ে চিকিৎসা করায়।

আবীরকে যখন ওর মা আর মামা নিতে এল, তখন মুহতামিমের কড়া নির্দেশ ছিল, কোনো ছাত্রই যেন আবীরের অভিভাবকের সঙ্গে কোনো প্রকার কথা বলতে না পারে। থানা সদর হাসপাতালের টিএইচএ আবীরের শুধু চোখ আর জিব দেখেই বলল, 'এখানে আমাদের কোনো কিছুই করার নেই, যত দ্রুত সম্ভব ওকে নিয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতালে রওনা দিন, আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একজন নার্স দিয়ে দিচ্ছি। একটুও দেরি না করে এক্ষুনি রওনা দিন'। শুধু দুটি ইনজেকশন দিয়ে আবীরকে উঠিয়ে দেওয়া হলো অ্যাম্বুলেন্সে। আবীরকে নিয়ে ওর মা, মামা আর একজন নার্স রওনা হলো ঢাকা শিশু হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে ওর মা আবীরের অনেক দিনের পাজামা-পাঞ্জাবি পাল্টাতে গিয়ে দেখল পাজামায় বিশেষ কিছু লেগে আগে, যা শুকিয়ে চটচটে হয়ে আছে। আরও দেখল সারা শরীরের পিটানোর দাগ কালো হয়ে আছে। এসব দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ওর মা। অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে ঢাকা পানে। কিন্তু সমস্যা হলো দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে। ওরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফেরিতে উঠেছে দেড় ঘণ্টার ওপরে হলো। কিন্তু ফেরি ছাড়ার নামগন্ধও নেই। আবীরের মা বারবার আয়াতুল কুরসি পড়ছে আর আবিরের বুকে ফুঁ দিচ্ছে। আরও আধা ঘণ্টা পর অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার এসে জানাল বিআইডব্লিউটির একজন উপসচিবের এই ফেরিতে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে আসি আসি করেও আসছে না, তাই ফেরি ছাড়তে দেরি

হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার তো বলে দিয়েছে, আবীরকে যত দ্রুত সম্ভব আইসিইউতে ঢোকাতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত খারাপ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

উপসচিব এল আরও ঘণ্টাখানেক পর। এই দীর্ঘ সময়ে আবীরের অবস্থা আরও খারাপ হলো। এখন কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেও সাড়া দেয় না। মুখ দিয়ে ফ্যানা ভাঙছে। নিশ্বাস নিচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। শরীরে জ্বর নেই কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। ওর মা ওর হাতের তালু, পায়ের তালু ঘষে গরম রাখার চেষ্টা করছে আর আয়াতুল কুরসি পড়ে বারবার ফুঁ দিচ্ছে। আল্লার কাছে বারবার বলছে, 'হে আল্লাহ্, তুমি আমার জানের বিনিময়ে হলেও আমার সোনা চান ময়না পাখির জীবনটা ভিক্ষা দাও'। কিন্তু আল্লাহ্ আবীরের মায়ের আরজি রাখল না। কাজ হলো না আয়াতুল কুরসিতেও। ফেরি ওপারে উঠে আধা ঘণ্টা চলার পর ওর নাড়ির আর খুঁজে পেল না নার্স। নার্সের ছেলেটাও একটা মাদরাসায় হাফেজি পড়ে। সে সিদ্ধান্ত নিলো ফিরে গিয়েই ছেলেটাকে মাদরাসা থেকে নিয়ে আসবে। অমন জানোয়ার মানুষকে ভালো কিছু শেখাতে পারে না। আবীরের অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিয়ে নার্স কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপা, ঢাকা যাইয়া আর লাভ নাই'।

সপ্তাহখানেকে ধরে বদিউজ্জামান নানাভাবে কৌশলে এখানকার ইয়াবার বাজার, চাহিদা, ভোক্তার পরিমাণ, দরদাম ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। খুচরা বাজার যতই ভালো হোক, সেখানে তো আর বদি ঢুকতে পারবে না। সে এই মাদরাসার হাদিসখানার একজন শিক্ষক, একজন হাফেজ মাওলানা, একজন মুফতি। তাকে পাইকারি ক্রেতাই খুঁজতে হবে। তারপর মুহতামিম আর বদিউজ্জামান ওরফে মোহাম্মদ ওমর আলী গেল সহসভাপতি গফ্ফার পাটোয়ারীর বাড়িতে। সময়টা রাত দশটার ওপরে। এসময় এই এলাকা একেবারেই সুনসান নীরব হয়ে যায়। নওশাদ চৌধুরীও ছোট বিবিকে নিয়ে সুখনিদ্রায় যায়। মুহতামিম আর ওমর আলীকে ড্রয়িংরুমে চা-নাস্তা দিয়ে গফ্ফার পাটোয়ারী বলেছে, তার হাতে একটি বিশেষ কাজ আছে। সেটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে তাদের কাছে ফিরবে। চা-নাস্তা শেষ করেও বেশ কিছু সময় পার করেছে দুজন। পাটোয়ারীর অল্প কিছু কাজ আর শেষ হচ্ছে না। আসলে সে কাজের কাজ কিছুই করছে না। শেষ বিবিকে নিয়ে স্টার জলসায় সিরিয়াল দেখছে। দুজন দীর্ঘ সময় বসে বসে গফ্ফার পাটোয়ারীর শানশওকতওয়ালা ড্রয়িংরুম দেখছে। বছর পনেরো আগেও এই গফ্ফার পাটোয়ারী ছিল ছিঁচকে চোর। এরপর শুরু করল সীমানা পিলার চুরি করে পাচারের কাজ। আর সেই ব্যবসা তাকে এক ধাক্কায় লাখপতি বানিয়ে দিল। এরপর যখন গুটির ব্যবসা শুরু করল, তখন সে লাখপতি থেকে হলো কোটিপতি। গুটির ব্যবসাকে কেউ বাবার ব্যবসাও বলে। বাবা মানে হলো ইয়াবা। গত বছর সে বড়বউকে নিয়ে হজ করে এসেছে। কিন্তু নামের আগে এখনো আলহাজ লাগায়নি। ইচ্ছা আছে চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রচারণা হিসেবে ইদের আগে যে 'ইদ মোবারক' জানিয়ে পোস্টার ছাপাবে, সেখানে নামের আগে আলহাজ্ব ও বিশিষ্ট সমাজসেবক কথাটা লাগাবে। সমাজসেবক তো সে অবশ্যই, ইসলামের সেবকও বটে। এলাকার সবচেয়ে বড় মাদরাসার সহসভাপতি সে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যও বটে। বছর তিনেক আগে সে নওশাদ চৌধুরীকে বলেছিল মাহফিলের সময় সে পাঁচ লাখ টাকা দেবে, বিনিময়ে তাকে মাদরাসা কমিটির

সেক্রেটারি করা হোক। টাকার কথা শুনে নওশাদ চৌধুরীর জিবে পানি আসতে দেরি হলো না বটে কিন্তু গফ্ফারকে সে সেক্রেটারি বানাতে পারবে না। কারণ, মাদরাসা কমিটির সেক্রেটারি তার খুব কাছের লোক, কাজের লোক। সে সেক্রেটারি হতে টাকাপয়সা দেয়নি বটে কিন্তু সে যা করছে, তা লাখ টাকার চেয়ে অনেক বড় উপকার। মাদরাসার সেক্রেটারি আলতাফ ব্যাপারী। আলতাফ ব্যাপারীকে দিয়ে নওশাদ চৌধুরীর যে কাজ হয়, তা গফ্ফারকে দিয়ে হবে না। আলতাফ ব্যাপারীকে সবাই চেনে কোর্টের দালাল হিসেবে। কেসের তদবির, থানায় মধ্যস্থতা, বড় সরকারি কাজ পাইয়ে দেওয়া, ব্যাংক লোন করিয়ে দেওয়া, ঠিকাদারি কাজ পাইয়ে দেওয়া –এসবই তার মূল পেশা। এসব কাজে তার জুড়ি নেই। এটাই তার একমাত্র পেশা কিনা, তা বোঝা মুশকিল। এর বাইরে সে অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদের পাশে কয়েকটি জুয়ার বোর্ড চালায়। আলতাফ ব্যাপারী নওশাদ চৌধুরী তথা মাদরাসার জন্য যে কাজ করেছে, তার বিনিময়ে কোনো দিন একটা পয়সাও দাবি করেনি, কিন্তু বাগিয়ে নিয়েছে সেক্রেটারির পদটা। এই পদ নওশাদ চৌধুরী অন্য কাউকে দেবে না। গফ্ফারের সঙ্গে ১০ লাখ টাকায় রফা করা হলো। সে যদি দশ লাখ টাকা দেয়, তাহলে তাকে এক নম্বর সহসভাপতির পদ দেবে নওশাদ চৌধুরী। কিন্তু এর মধ্যেও একটা উপরফা করল গফ্ফার। সে দেবে দশ লাখ টাকা কিন্তু মাইকে ঘোষণা করা হবে বিশ লাখ টাকা। তাতে বরং উপকারই হলো নওশাদের। জোশে জোশে সেবার অনেকেই অনেক টাকা দিয়েছিল। আর সাবেক ছিঁচকে চোর বর্তমান স্মাগলার ও মাদক ব্যবসায়ী গফ্ফার চৌধুরী পেল মাদরাসার এক নম্বর সহসভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বারের পদ।

আরও ঘণ্টাখানেক পর গফ্ফার চৌধুরী এসে ক্ষমা চাইল মুহতামিম আর মোহাম্মদ ওমর আলী ওরফে বদিউজ্জামানের কাছে। গফ্ফার পাটোয়ারী ইদানীং আর দাড়ি ছোট করে রাখছে না। ছেড়ে দিয়েছে। বড় হোক নবীর সুন্নত। আল্লা-নবীর নুর, না ছোঁয়াইলাম ক্ষুর। তবে মোচ চেঁছে ফেলেছে। মাথায় উঠে এসেছে টুপি। দাড়িগুলো আরেকটু সাদা হলে মেহেদি দেবে গফ্ফার। শুনেছে নবীজী দাড়িতে মেহেদি দিতেন।

মুহতামিম বলল, 'ভাইজান, একটু গুফোন কতা আছিল'। একথা শোনার পর ভেতর ঘরের সঙ্গে বসার ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিল। এরপর লাগাল সব জানালা। এরপর মুহতামিম তার গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল, 'কোতাইদ্দা ক্যামনে শুরু করমু, বুঝতেছি না, একটু লজ্জাও লাগতেছে'।

– আরে, কিসের লজ্জা? কোনো লজ্জা-শরমের দরকার নাই। এইডা আমার বাড়ি। মনে করেন আপনার নিজের বাড়ি। এইখানে আপনে যা ইচ্ছা কইতে পারেন। লজ্জা-শরম-ভয়ের কোনো কারণ নাই।

– না, মানে বলতেছিলাম যে আপনার আরেকটা ব্যবসা আছে না?' জবাবে গফ্ফার পাটোয়ারী মুখে রহস্যের হাসি ঝুলিয়ে বলল, 'মানে?'

– মানে হইলো গুটির ব্যবসা আরকি...।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গফ্ফার বলল, 'ছি ছি ছি, মাওলানা সাব, ওই ব্যবসা দিয়া আপনে কী করবেন?' বলে আবার নিজেই হেসে দিল। জবাবে মুহতামিম বদি ওরফে মোহাম্মদ ওমর

আলীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গফ্ফারের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা যদি আপনার লগে এই ব্যবসা করতে চাই?' গফ্ফার পাটোয়ারী আট-দশ সেকেন্ড চুপ থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল। মাদরাসার মাস্টাররা বেশি সুবিধার হয় না, জানে গফ্ফার। নানা রকম দোষ থাকে তাদের। বিশেষ করে কচি পোলার দোষ। তাছাড়া এরা যে ইদানীং ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়েছে, তা গফ্ফারের অজানা নয়। নীবরতা ভেঙে গফ্ফারই বলল, 'বলেন কী!' বেশ অবাক হওয়ার ভাব দেখাল গফ্ফার। মুহতামিম বলল, তারে তো আপনে চেনেনই। তার এই বিষয়ে ভালো লিঙ্ক আছে।

– তাই নাকি?

– হ, সে চিটাগাঙে মাদরাসায় পড়ছে, কক্সবাজারের পেকুয়া মাদরাসায় চাকরি করছে। অভাবে পইড়া এই লাইনে কাজকাম করছে কিছুদিন। এই বদ...ওমর আলী সাহেব আপনে বলেন।

ওমর আলী পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের কৌটা বের করে তার মুখ খুলে গফ্ফার পাটোয়ারীকে বলল, 'হাত পাতেন জনাব'। গফ্ফারের হাতে সে ঢেলে দিল ৫০টা ইয়াবা। মাল দেখে গফ্ফার বেশ অবাক। নিজের অজান্তেই বলে উঠল, 'একের মাল!'

– আপনার যত লাগে দিতে পারব। এখন আপনে বলেন পিস কত কইরা দিবেন আমারে। পাইকারি রেট বলবেন। খুচরা আপনে যা ব্যাচেন বেচবেন, আমার অসুবিধা নাই।

এমন কথায় একটু ভাবনায় পড়ে গেল গফ্ফার। এইরকম মাল তারে চিটাগংয়ের সাইফুলও সহসা দিতে পারে না। খুচরা বাজারে এর চাহিদা-দাম দুটোই বেশ ভালো। এই মাল সে নিজেই খুচরা বিক্রেতাদের কাছে চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকায় বিক্রি করতে পারবে কোনো রকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই। সে যদি ওমর আলীর কাছ থেকে তিনশো বা সাড়ে তিনশো টাকায়ও কেনে, তাতেও তার প্রতিপিস মালে একশো থেকে দেড়শো টাকা লাভ থাকবে। তারপরও একটু হাতে রেখে বলল, 'আপনারে আড়াইশো কইরা দিতে পারুম'। দাম পছন্দ হলো না বদির। সে এই কদিন পর্যবেক্ষণ করেছে। খুচরা-পাইকারি সব বাজারই ঘেঁটেছে। বলল, 'জনাব, এই দামে তো আমি কিনতেও পারিনাই। থাক তাইলে'। গফ্ফার পাটোয়ারী বলল, 'আরে ভাই, ব্যস্ত হন কেন? আপনে কত হইলে ছাড়তে পারবেন?'

– সাড়ে তিনশো।

– না ভাই, আমারও তো লাভ করতে হইব। থানা-পুলিশ-দলের পোলাপান কত কী! আপনে তিনশোতে ছাইড়া দেন।' তখন বদি বলল, 'আপনার কথাও থাকুক, আমার কথাও থাকুক। তিনশো পঁচিশ কইরা দেন। আপনের কত পিস লাগবে বলেন, আমি দুই দিনের মধ্যে আপনার হাতে নিজে মাল দিয়া যাব'।

– দুই দিন?

– মাল তো আমার সঙ্গে নাই। আপনে অগ্রিম দিলে আমি আইনা দিতে পারব। আমার মাল আইতে দুই দিনের বেশি লাগবে না। তয় মাথায় রাইখেন, আমি সরাসরি বার্মা থেকে মাল আনাই। আমার চাইতে ভালো মাল আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। এ কথা আমি আপনারে গ্যারান্টি দিয়া বলতে পারি। কিন্তু আমারে অগ্রিম টাকা দিতে হবে।

– আচ্ছা, সমস্যা নাই, বড় হুজুর মাঝখানে থাকলে আমি আপনারে কুটি ট্যাকা দিতে পারুম, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আপনে দুই দিনের বেশি নিয়েন না।
– দুই দিনের বেশি এক ঘণ্টাও নিব না। দুইদিন পর ঠিক এই সময় এইখানে মাল পাবেন ইনশা আল্লা! এটা আমার ওয়াদা।
– ঠিক আছে, তাইলে আমারে প্রথম পাঁচ হাজার মাল দেন।
ডিল ফাইনাল হয়ে গেল। টাকা হিসাব করে গফ্‌ফার বদির হাতে ১৬টি একহাজার টাকার বান্ডেল দিল।
– খুচরা আরও কিছু পাবেন, মাল দেওয়ার সময় নিয়েন, নাকি?
– আচ্ছা, ঠিক আছে। পরশু ঠিক এই সময় আমি নিজে আপনার হাতে মাল দিয়া যাব। আমার মোবাইল নম্বরটা রাখেন। আর আপনারটাও আমারে দেন। নম্বর বিনিময়ের পর বদি তার হাতের প্লাস্টিকের কৌটাটি গফ্‌ফারের হাতে দিয়ে বলল, 'এইগুলা আপনে টেস্ট কইরেন'। সবিনয়ে ফেরত দিয়ে গফ্‌ফার বলল, 'ভাইজান, আমি এত ভোদাই না যে এই বিষাক্ত জিনিস খাব। আপনে নিয়া যান'।
গফ্‌ফার পাটোয়ারীর বাড়ি থেকে বের হয়ে দুজন খুশিতে ষোলোখান হয়ে গেল। তারা ভাবতেও পারেনি এত সহজে এত বড় একটা বিজনেস ডিল হয়ে যাবে। মুহতামিম বদিকে পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, 'ওই, মাল তো আইজই দিয়া আইতে পারতা। দুই দিন সময় নিলা কেন?'
– আরে ওস্তাদ, আপনেও আছেন...বোঝেন না কিছুই। এত সহজ-সরল হইলে এই লাইনে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমার স্টকে যে মাল আছে, এইডা তারে বুঝতে দিমু ক্যান? সব সময় মনে রাখবেন, এই লাইন এত সহজ না। সহজে কাউরে বিশ্বাস করা হারাম, এককথায় হারাম। কথাটা মাথার মধ্যে আইজ গাঁইথা নেন।
রুমে গিয়ে দুজন মাথা থেকে টুপি খুলে শুরু করল চকাস চকাস। সবকিছু শেষ হওয়ার পর বদি মুহতামিমকে একটা এক হাজার টাকার নোটের বান্ডেল দিয়ে বলল, 'এইডা আপনার কমিশন'। মুহতামিম বিস্মিত হয়ে বলল 'এতো টাকা!' 'আরে ওস্তাদ, কইলাম না, এই লাইনে খালি টাকা আর টাকা। কাঁচা টাকা। আরও কত পাইবেন! এইডা হইল টাকার খনি। দেখেন আমি কী করি। অমন নওশাদ চৌধুরী আমি আপনার পায়ের তলায় আইনা ফালামু'।
নিজের রুমে গিয়ে টাকাগুলো বিছানায় বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ল বদি। তার নিজের এতগুলো টাকা, তা ভাবতেই আনন্দে মনটা আকাশে উড়তে চায়। বদি পাঁচ হাজার ইয়াবা আলাদা করল। এই ইয়াবা বদি কীভাবে পেয়েছে, সেই সত্যটা ভাঙেনি মুহতামিমের কাছে। বলেছে বিক্রি করে করে আস্তে আস্তে টাকা দিতে হবে।

মারুফের আর যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। তার পায়ে ঘা হয়েছে শিকলের ঘষায় ঘষায়। দগদগে ঘা। তার ওপর একবার জিহাদি ওস্তাদ, একবার আবু বক্কর ওস্তাদ শিকল খোলার লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে খারাপ কাজ করেই যাচ্ছে। প্রায়ই টয়লেটে গেলে ওর মলদ্বার থেকে তাজা রক্ত ঝরে। গত শুক্রবার মা এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। তখন শিকল খুলে দিয়ে গ্রিলের ফাঁকা দিয়ে কথা বলেছে। কিন্তু জিহাদি ওস্তাদ বড় একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যা মা তার পাশ থেকে দেখতে পায়নি। মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগে ওস্তাদ বলেছে, মাকে কিছু বললে তাকে জবাই করে ফেলা হবে। ফলে মাকে মারুফ আর কিছুই বলতে পারেনি। জিহাদি ওস্তাদ মাকে বলেছে, 'আপনার ছেলের সঙ্গে বদ জিন আছে। ভয়ংকর বদ জিন। আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে জিন। আমাদের কিছু করার নাই'। মা-ও সে কথা বিশ্বাস করেছে। মা বলেছে, 'ও জন্মের পর থেকেই কেমন যেন। ও রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটে। তখন আমরাও সন্দেহ করছি, ওর লগে খারাপ কিছু আছে। এখন কিছু করার নাই, হুজুর?' 'আমরা চেষ্টা করতে পারি। ওই যে আপনে বললেন রাতে ঘুমের মইদ্দে হাঁটে, এইডা কি আর ও হাঁটে? জিন নিয়া যাইতে চায়। কহন কনে নিয়া যায়, কেডা জানে? তয় আমরা চেষ্টা করতে পারি। আর সে চেষ্টাও এত সহজ না। এই বদজিন সহজে সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের ছাত্র, আমাদের সন্তান। অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতে খরচা আছে, বোন'।

খরচ যতই হোক, তা দিতে সমস্যা নেই মারুফের মায়ের। মারুফের বাবা ভূমি অফিসের কেরানি। তার টাকাপয়সার কোনো অভাব নেই। যত লাগে দিতে পারে। মারুফের বাবার যে উপরি কামাই, তা দিয়ে ওর বাবা এমন মাদরাসা কয়েকটা দিতে পারবে। এই জিন ছাড়াতে আর কয় লাখ টাকা লাগবে? সে তার খয়েরি রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করে দশটা লালচে রঙের একহাজার টাকার নোট বের করে জিহাদি হুজুরের হাতে দিয়ে বলল, 'টাকাপয়সা কোনো সমস্যা না। লাগলে আরও বলবেন'। লাগবে তো বটেই। অমন বদজিন আয়ত্তে আনা কি আর চাট্টিখানি কথা! কোহেকাফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বিশেষ সাধনার মাধ্যমে কথা বলতে হবে জিনের বাদশার সঙ্গে। মারুফের মা যেন তার পারসোনাল বিকাশ নম্বরে আরও হাজার দশেক টাকা খরচসহ বিকাশ করে দেয়। মারুফের মা সে কথা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল। মারুফের মা চলে যাওয়ার পর সেই রাত থেকেই বিশেষ চিকিৎসা শুরু হলো মারুফের। নানা ধরনের চিকিৎসা করে ফজরের আগে মারুফকে আবার শিকল পরিয়ে তার জায়গায় রেখে দিল। কিন্তু তালাটা টিপ দিয়ে লাগানোর সময় একটু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তালাটা আর ঠিকমতো লাগল না, খোলাই রয়ে গেল। আর সেই খোলা তালাই জীবনের জন্য কাল হলো মারুফের। সকালের অগোচরে সে ব্যথাযুক্ত পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনেক কষ্ট করে উঠল ছাদে। উঠে লুকিয়ে রইল। এখন এখান থেকে বের হওয়া যাবে না। কলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া আছে। বের হবে যখন সবাই পড়তে

বসবে। তখন বের হয়ে মারুফ মুক্ত হবে এই বন্ধ ঘরের অন্ধকার থেকে, হবে শৃঙ্খলমুক্ত। কিন্তু সেটা আর হলো না। খোলা ছাদে দিনের আলোয় ওকে দেখে ফেলল আবু বক্কর ওস্তাদ। সে ডাকল জিহাদি ওস্তাদকে। মাদরাসায় শুরু হলো চিৎকার-চেঁচামেচি। কথা উঠল, মারুফকে জিনে নিয়ে ছাদে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসার বেশিরভাগ ছাত্র সে কথা বিশ্বাস করল। জিনে ধরা মারুফকে দেখতে নিচে ছাত্ররা দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে। জিহাদি ওস্তাদ হাদিসখানার দুই ছাত্র নিয়ে রওনা হলো ছাদে আর জোরে জোরে সুরা জিন পড়তে শুরু করল। মারুফ তা দেখে নিজেও চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল। বলল, 'আমারে ধরতে আইলেই আমি লাফ দিমু। তোরা আমারে অনেক কষ্ট দিছস। আমি আর সইতে পারছি না। কেউ ছাদে আইলেই আমি লাফ দিমু'। নিচে দাঁড়ানো সবাই শতভাগ নিশ্চিত হলো, একথা মারুফ বলছে না, তাকে দিয়ে জিন বলাচ্ছে। জিহাদি হুজুর সুরা জিন পড়ছে বলে মারুফের সঙ্গে থাকা বদ জিনের গায়ে জ্বালা ধরে গেছে। সুরা পড়তে পড়তে কাছে আসতেই মারুফ ছাদ থেকে বাগানের দিকে দিল লাফ। নিচে পড়েই সঙ্গেসঙ্গে জ্ঞান হারাল সে। সবাই মনে করল সে মারা গেছে। কিন্তু তখনও ওঠা-নামা করছিল মারুফের ছোট্ট বুক। রাগে হিসহিস করছে জিহাদি ওস্তাদ। এই ছাত্র এখন মারা গেলে তার কিছুই হবে না, কারণ, সবাই জিনের কাণ্ডকারখানা দেখেছে। কিন্তু মারা গেলে তো ওর মা আর বাকি টাকা বিকাশ করবে না। মারুফকে তুলে নিয়ে আটকে রাখা হলো একটি বদ্ধ ঘরে। পায়ে আবার লাগানো হলো শিকল।

প্রচণ্ড জ্বরে মারুফ প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। থেকে থেকে বলছে,'মা, আমি মাদরাসায় থাকমু না, আমি মাদরাসায় থাকমু না'। সবাই নিশ্চিত হলো, ভয়ংকর দুষ্ট জিন এখনো মারুফকে ছেড়ে যায়নি। পরের দুই দিন খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ হয়ে গেল মারুফের। মুখ থেকে বের হতে শুরু করল সাদা সাদা ফেনা। ফোন করে ডাকা হলো তার মাকে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে ওর মাকে বর্ণনা করল ভয়ংকর জিন ওর সঙ্গে কী কী করেছে। এবার মারুফের মায়েরও বিষয়টি নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না। দুই পা ফুলে ঢোল হয়েছে ওর। সেখানে কেউ আঙুল ছোঁয়ালেই সে চিৎকার করে উঠছে। মুহতামিম দেখল, অবস্থা খুবই খারাপ। একে এখন হাসপাতালে ভর্তি না করলে হয়তো মারাই যাবে। ভর্তি করা হলো হাসপাতালে। সেখানেও মারুফের মা জিনে ধরার বর্ণনা করতে গেলে তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে এক্স-রের নির্দেশ দিল ডাক্তার। এক্স-রেতে কোনো জিন ধরা না পড়লেও ধরা পড়ল তার দুই পা তিন জায়গায় ভেঙেছে। সতেরো দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মারা গেল নয় বছরের শিশু মারুফ। ডাক্তাররা ওর মাকে মাদরাসার হুজুরদের বিরুদ্ধে মামলা করতে বলে অনেক গালি খেল। ইসলামের ঘোর শত্রু ইহুদি-নাসারার দালাল না হলে কোরআনের হাফেজদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা করতে বলে? যা করার জিনে করেছে। দ্বীনের খেদমতদার, কোরআনের পাখি, আল্লাহ্‌র খাস পেয়ারের বান্দা হাফেজদের কী দোষ? তারা কি ওকে জিনের হাত থেকে বাঁচাতে কম চেষ্টা করেছে? যা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে হয়েছে। তার হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না।

মাস খানেকের মধ্যে বদিউজ্জামান ওরফে মোহাম্মদ ওমর আলী মাদরাসায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। মাদরাসায় রটে গেল মুফতি ওমর আলী আসলে বিশাল শিল্পপতির একমাত্র সন্তান। টাকার কুমিরটুমির নয়, একেবারে ডাইনোসর। এমনকি কমিটির সভাপতি নওশাদ চৌধুরীকেও কয়েকবার বেচতে-কিনতে পারে সে। এমন পাড়াগাঁয়ে মাদরাসায় তার চাকরি করার কারণ তার পরিবারের লোকজন ঠিক অতটা ইসলামি মানসিকতার নয়। তারা দুনিয়াবি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই থাকে। ফলে পরিবারের সঙ্গে তার খুব একটা ভালো সম্পর্ক নেই। নিজের রক্তের শিরায় শিরায় বইছে ইসলামের চেতনা। কিন্তু পরিবারের সেটা তেমন পছন্দ নয়। তাই সে পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকে। এখানে সে টাকাপয়সার জন্য নয়, বরং ইসলামের সেবা করার জন্য এসেছে।

মাদরাসার মুহতামিম বাদে আর কোনো শিক্ষকেরই অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। মুহতামিমের পর সর্বোচ্চ বেতন পায় জিহাদি হুজুর, ছয় হাজার টাকা। সব শিক্ষকেরই অর্থনৈতিক অসুবিধা রয়েছে। কারও মায়ের চিকিৎসা করাতে পারছে না, কারও হয়তো সন্তান অসুস্থ, কেউবা টাকাপয়সার স্বল্পতার দরুন বিয়ে করতে পারছে না। ওমর আলী সবাইকে অল্প বিস্তর টাকাপয়সা দিয়েছে। তবে দান নয়। তিনশো টাকার স্ট্যাম্পে নোটারি করে ধার দিয়েছে। তারা সবাই বদিউজ্জামানের একপ্রকার কেনা গোলাম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। গফ্ফার পাটোয়ারী দুই-তিন দিন পরপর মালের অর্ডার করে। আর প্রতিবার বিক্রির টাকা থেকে মুহতামিমকে একটা ভালো অঙ্কের কমিশন দেয়। এর মধ্যেই এই মাদরাসার আয়োজনে একবার বিরাট মাদকবিরোধী র‍্যালি হয়েছে, হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল, যার প্রথম সারিতে ছিল গফ্ফার পাটোয়ারী, মুহতামিম, ওমর আলীসহ মাদরাসার সব শিক্ষক।

মাদরাসায় হঠাৎ এমন পরিবর্তন, গফ্ফারের সঙ্গে মুহতামিমের ঘাঁটাঘাঁটি চোখ এড়ায়নি নওশাদ চৌধুরীর। একদিন বাদ মাগরিব মুহতামিমের ডাক পড়ল নওশাদ চৌধুরীর বাড়ি। কোনো রকম ভণিতা ছাড়াই জিজ্ঞেস করল, 'কী মাওলানা? সাপের পাঁচ পাও দ্যাখছ নাকি? হুনলাম আবুল বাশারেখন ১০ কাঠা জমি বায়না করছ?' মুহতামিমের বলতে ইচ্ছা করছিল, 'করছি হারামজাদা, তাতে তোর কী? তোর ট্যাকা দিয়া করছি?' কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে আগের মতোই কথা বলতে চায় মুহতামিম। কারণ, সেই সময় এখনো আসেনি। বদি তাকে বলেছে নওশাদ চৌধুরীকে নিয়ে আলাদা প্ল্যান আছে তার।

– জ্বি জনাব, কিছু টাকা ছিল, তাই কেনার জন্য বায়না করে ফেলেছি। আপনে তো আমার সবই জানেন।

– না, জানি না। আগে জানতাম। এখন তো আর কিছুই জানি না। এখন তোমার বান্ধব হইল গফ্ফাইরা। পিলার চোর গফ্ফার পাটোয়ারী তোমার জানের জান আব্বাজান। সত্যি কইরা কও তো মাওলানা, এত ট্যাকা তুমি কই পাইলা?

এমন প্রশ্নের জবাব ঠিক করাই ছিল মুহতামিমের কাছে।
– নতুন মুফতি সাহেবের কাছ থাইক্কা ধার লইছি কিছু, নিজের কাছে আছিল কিছু।
– নতুন মুফতি এত ট্যাকা কই পাইল? সে এখানে চাকরি লইছে তিন মাসও হয়নাই। এর মধ্যে সে সব মাস্টারগো ট্যাকা ধার দেয়। বিষয় কী? এই নতুন মাস্টার কেডা? তারে কই পাইছ? তার বিস্তারিত আমারে জানাও তো। সে এত টাকা কই পাইল?' মুহতামিম তারে বদির শেখানো গল্প বলল।
– হে যদি শিল্পপতির পোলাই হইব, তাইলে দ্যাশ-গ্যারামে আইয়া মাদরাসায় চাকরি লইতে যাইব ক্যান? আর গফ্ফার পাটোয়ারীর লগে তোমাগো হঠাৎ এত পিরিত, ঘটনা কী, মাওলানা? রাইতের ব্যালা লুকাইয়া লুকাইয়া তার বড়িতে যাও তোমরা, ঘটনা কী?
– লুকাইয়া যাব কেন, জনাব? সে দাওয়াত দিছিল নতুন মুফতি সাবরে। তারে একদিন ডাইকা দাওয়াত খাওয়াইল। আমিও লগে গেছিলাম। সে-ও তো এই মাদরাসা কমিটিরই সহসভাপতি।
– কতাডা যত সহজে কইলা, কতাডা তো অত সহজ না। আমার কাছে মনে হইতেছে কোনো ভ্যাজাল আছে।
একটু থেমে আবার বলল, 'দেখো মাওলানা, আমি তোমারে রাস্তা থাইকা তুইলা আইনা আমার নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিছি। মাদরাসা-মসজিদ বানায়া দিছি। সব করছি নিজের জমিতে নিজের ট্যাকা দিয়া। এই যে দশ গ্যারামের মানুষ তোমারে চিনে, তোমারে বড় হুজুর কইয়া ডাকে, সম্মান করে, ইজ্জত দেয়–এই সবই যে আমার জন্য, তা তুমি অস্বীকার করতে পারবা?'
– ছি ছি ছি, জনাব, অস্বীকার করব কেন? এইসব আপনে কী বলেন? আপনেই তো আমার বাপ-মা। আপনে ছাড়া আমার আর কোনো অস্তিত্ব আছে?
– এইসব তোমার মনের কথা না, মাওলানা। তোমারে আমি চিনি না মনে করছ? তুমি হইলা একটা মিনমিন্না শয়তান। আর হেইডা আমার চাইতে ভালো কেউ জানে না। তুমি আমারে ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার চেষ্টা কইরো না, মাওলানা। আমি কিন্তু সবই বুঝি। বেশি লাফাইলে টেংরি ভাইঙ্গা দিমু, বুচ্ছ? বেশি ওড়ার চেষ্টা কইরো না। তোমার নাটাই কিন্তু আমার হাতে। সুতা কাইট্টা দিলে গোঁত্তা খাইয়া পইড়া থাকবা। সারা জীবন জেলে পইচা মরবা। তহন তোমারে কুত্তায়ও চুদব না। বুচ্ছ?
এমন আরও অনেক কথা বলে নওশাদ চৌধুরী তাকে ধুয়ে ছেড়ে দিল। চরম অপমান বোধ করল মুহতামিম। ইচ্ছা করছিল বুইড়া হারামজাদারে পা দিয়ে পিষে মারে। সুদি নশু এমন অপমান-অপদস্থ আরও বহুবার করেছে। তখন এত অপমান লাগেনি। কিন্তু এখন লাগছে। তখনকার সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। এখন মুহতামিমের কাছে অনেক টাকা। আর তার মুঠোর মধ্যে আছে বদিউজ্জামান ওরফে মোহাম্মদ ওমর আলী। হ্যাঁ, মুহতামিমের নাটাই নওশাদ চৌধুরীর হাতে যে ছিলো এ কথা মিথ্যা নয়। তবে এখন আর নাই। সে মুহতামিমের অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী বটে। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে মুহতামিমের কাছ থেকে কম ফয়দা লোটেনি। নওশাদ চৌধুরী এখনো

মুহতামিমকে সেই আগে ভূমিহীন রাস্তার ভিক্ষুক ভাবতে চায়। কিন্তু এখন সেই আগের দিন যে আর নাই! মুহতামিম তার প্রেমিক বা প্রেমিকা বদিউজ্জামানকে সব জানাল। বদি সবকিছু জেনে বলল, 'মোস্তাক মালটারে কেনা যায় না?'

– কেনা যাবে না কেন? এলাকার অনেকেই বলে এই মোস্তাকের বাবা-মাকে সুদি নশুই পোড়াইয়া মারছে।

– তাই নাকি?

– সত্য-মিথ্যা জানি না। আমি আসার অনেক আগের ঘটনা। তবে এই কাম তার দ্বারা অসম্ভব না। যে কেসে জেতার জন্য তার নিজের এক মাইয়ারে নিজ হাতে খুন করছে, তার স্বাক্ষী আমি নিজে।

– আচ্ছা, আপনে আমারে মোস্তাকের কিছু দুর্বলতা আর পছন্দের জিনিস বলেন। বাকিডা আমি দেখতাছি।

– মোস্তাকের মেয়েছেলের দোষ আছে, বাবা খায় আর মাঝেমধ্যে মদও খায়। তার চাচা তারে দিয়া অনেক কাম করাইছে। সে তার চাচার সবকিছু জানে। তার চাচার সহায়-সম্পত্তি টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স কোথায় কী আছে, সব এই মোস্তাক জানে, আর কেউ জানে না। তার পোলারাও জানে না, কোনো বউও জানে না।

– বাহ্! মোস্তাকের কচি পোলার শখ নাই?

– নাহ। এইডা তার চাচার আছে।

– আচ্ছা, আর কিছু লাগবে না। বাকিটা আমি দেখতাছি।

– তয় মনে রাইখো, আমাগো সবচাইতে বড় ঘুঁটি কিন্তু গফ্ফার পাটোয়ারী, তার শত্রু।

– কার?

– নওশাদ চৌধুরীর। তুমি টের পাও নাই এত দিনে?

– কিছুডা তো টের পাইছি। আচ্ছা, আপনে কিছুই চিন্তা কইরেন না। আমি বাকিডা দেখতাছি।

◆ ২৮ ◆

সুদি নশু মুহতামিমের যে খুনের স্বাক্ষী তা দিয়ে নশু এখন আর কিছুই করতে পারবে না। কারণ, যখন থেকে নশুর সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, যখন সে বারবার ওই বিষয়টি নিয়ে বলতে থাকে, তারপর এক রাতে মুহতামিম নিজ হাতে ওই শিশুটির হাড়-খুলি-দেহাবশেষ নিয়ে কেন্দ্রীয় কবরস্থানের একটা ভাঙা কবরের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছে। এখন সেখানে আর কেউ কিছু খুঁজেই পাবে না। সুতরাং সুদি নশুকে ভয় পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

মোস্তাককে কবজা করা গেল খুব সহজেই। তার কথাবার্তায় বোঝা গেল, সে এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বহুদিন ধরে। সে নাকি ছোটবেলা থেকেই সন্দেহ করে আসছিল, শুধু সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে সুদি নশু তার বাবা-মাকে ঘরে আটকে পুড়িয়ে মেরেছে। কিন্তু সময়-সুযোগ পায়নি কিছু করার। কারণ, মোস্তাকের কেউ নেই। মোস্তাক বড্ড একা। মোস্তাককে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাতে সে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই রাজি হয়ে গেল। খুব দরকার বলে সে মোহাম্মদ ওমর আলীর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা নিয়েছে কেবল। আর খাওয়ার জন্য তাকে প্রচুর ইয়াবা দেওয়া হয়েছে। সে শুধু একটা শর্ত দিয়েছে। তার চাচার পতনের পর সে এই মাদরাসার সভাপতি হতে চায়। মুহতামিম বলল, 'আরে, এই মাদরাসা তো তোমার জমির উপরেও আছে, আছে না?'

– তা তো অবশ্যই আছে। হে তো আমগো সব জমি-বাগান দহল কইরা নিছে।

– তাইলে? এই মাদরাসা তো তোমারও। তুমিই তো সভাপতি হইবা। আমরা হইলাম শিক্ষক। আমরা তো আর সভাপতি হইতে যামু না, ভাই। সভাপতি তোমারেই বানামু। এইসব নিয়া তুমি ভাইবো না।

টগরের শরীরটা আজকাল আর ভালো যাচ্ছে না। সকাল থেকে জ্বর জ্বর। তার পাইলসের ব্যথা বেড়েছে। কিন্তু পাইলসের ব্যথা যতই বাড়ুক, সে বুঝে ফেলেছে ওস্তাদরা যখনই বলবে অন্য ছাত্রদের মতো তখনই তাকে পাজামা খুলে শুয়ে পড়তে হবে। টগরের মাদরাসাজীবন আর ভালো লাগছে না। বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে ও। ওর ধারণা, এখানে থাকলে ও মরে যাবে। তার চেয়ে ভালো সে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করে খাবে। তাও এই মাদরাসায় আর থাকবে না। এখান থেকে টগর পালাবেই পালাবে। এমন জীবন আর এক মুহূর্তও চায় না। টগর এত দিনে বুঝে গেছে, জিনটিন আসলে কিছুই না। কবীর মাওলানা যা করেছে, সব মিথ্যা। এর আগে যারা জিন হুজুরের লালসার শিকার হয়েছে, তারা অনেকেই বিষয়টি বলেছে টগরকে। কিন্তু টগর বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিগত তিন মাসে অন্তত বিশবার ধর্ষিত হওয়ার পর সে সবকিছু বুঝে গেছে। জিন হুজুরের ঘরে গেলে সে আজকাল আর জিনটিনের কথা বলে না। সরাসরি বিছানায় নিয়ে পাজামা খুলে শুরু করে দেয়। আর টগর না করলে

পরদিন ক্লাসে নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। আসরের কিছু পর টগর কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বের হয়ে গেল মাদরাসা থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না। জিহাদি ওস্তাদ আর মোক্তার ওস্তাদ তখন ফিরছিল বাজার থেকে। তারা টগরকে জোরে জোরে হাঁটতে দেখে খপ করে ধরে ফেলল। তারপর দুজন টগরকে ধরে কোরবানির পশুর মতো টানতে টানতে নিয়ে চলল মাদরাসার দিকে। কিন্তু টগর তো আর যেতে চাইছে না। সে মাটিতে শুয়ে গেল। দুই ওস্তাদও ওকে টানতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল। টগর "আল্লা গো আমারে বাঁচাও" বলে চিৎকার করে কাঁদছে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল পেট মোটা জিহাদি ওস্তাদ। তারপর আবার টানতে লাগল। এরপর ওর পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল হাফেজ মোক্তার। ব্যথায় টগর "ওবাবা ওমা ও আল্লা" বলে চিৎকার করে কাঁদছে। মোক্তারের দেখাদেখি জিহাদিও ওস্তাদ উঠে দাঁড়াল ওর অন্য পায়ের ওপর। টগর আরও জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল। এমন সময় এক মহিলা একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। সে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে ছাড়াল দুজনকে। এরপর তারা আর ঝুঁকি নিল না। দুজনে চ্যাংদোলা করে টগরকে নিয়ে গেল মাদরাসায়। নিয়েই কোনো প্রকার কথা না বলে পায়ে শিকল লাগিয়ে দিল।

◆ ২৯ ◆

প্রতিবার কেসের জন্য হাজিরা দিয়ে ফেরার পথে নওশাদ চৌধুরী তার মাদরাসার খাসকামরায় একজন অল্প বয়সী ছাত্র আর বোতল নিয়ে কিছু সময় কাটায়। এবারও তার ব্যত্যয় হলো না। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটল মুহতামিম, ওমর আলী, অন্যান্য শিক্ষক, ভাতিজা মোস্তাকের কাজে। সঙ্গে প্রস্তুত আজ গফ্ফার পাটোয়ারী। সেই সঙ্গে প্রস্তুত আছে এলাকায় নওশাদ চৌধুরীর বিরোধী পক্ষ। লোকাল পত্রিকার সাংবাদিক আর জাতীয় পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি, যারা এত দিন নওশাদ চৌধুরীর পয়সা খেয়ে মাদরাসার একটা ঘটনারও সংবাদ হতে দেয়নি, তারা গফ্ফার পাটোয়ারী আর মোহাম্মদ ওমর আলীর কাঁচা টাকার গন্ধে ইমান হারিয়ে ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করছে মাদরাসারই একটা কক্ষে। এসবের কোনো কিছুই টের পায়নি সুদি নশু। সে প্রতিবারের মতো এবারও হাজিরা শেষে কোর্টের পাশের 'বিসমিল্লাহ কাবাব ঘর' থেকে একটা আস্ত মুরগির গ্রিল আর বিশেষ সাপ্লায়ারের সাপ্লাই করা মেথরপট্টির 'দেশি পানি' নিয়ে মাদরাসায় চলে এল। চার-পাঁচ ঢোঁক খাওয়ার পর তার সেবায় চলে এল এক কচি ছাত্র। একটু একটু নেশা হচ্ছে সুদি নশুর। ছাত্রটিকে রুমে ঢুকিয়ে দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিল। কিন্তু ছিটকানি লাগানোর সময় খেয়াল করল না যে ছিটকানির রডটা যেখানে ঢুকিয়েছে, সেটা খুবই আলগা এবার। আগের মতো শক্ত নয়। ছাত্রটি রুমে ঢোকার পর নওশাদ চৌধুরী বরাবরের মতো কাপড়চোপড় খুলে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল। ছাত্রটিও কাপড়চোপড় খুলে সুদি নশুর সারা শরীরে তেল দিয়ে মালিশ করতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে নিম্নাঙ্গ গরম হতে শুরু করল সুদি নশুর। ছাত্রটিকে নিচে শুইয়ে যখন চূড়ান্ত কাজ শুরু করল, তখনই পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ছাত্রটি উহ্ব্যথা বলে একটু জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল এক ঝাঁক মানুষ, যাদের প্রত্যেকের হাতে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা, সব কটিতে ভিডিও চলছিল। কারও-বা মোবাইলে ভিডিও হচ্ছিল। এমনটা হতে পারে তারই মাদরাসায় তারই নিজের খাসকামরায়, তা সে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। কোনো রকম প্রতিরোধে না গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সবার দিকে। তিন-চারজন অপরিচিত লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ সুদি নশুকে গলায় গামছা লাগিয়ে কোরবানির গরুর মতো টানতে টানতে মাদরাসার মাঠের মাঝখানে নিয়ে এল। তার সারা শরীরে তেল চপচপ করছে। এই ফাঁকে কেউ একজন মদের বোতলটা উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে তার মাথায়। দেশি মদের দুর্গন্ধ পরিবেশটাকে আরও বেশি সুদি নশুর বিপক্ষে নিয়ে গেল। খালি গায়ে তার তেল-চকচকে পেটটি দেখার মতো একটা বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মুখের বেশির ভাগ সাদা দাড়িতে দুয়েক জায়গায় মুরগির গ্রিলের মসলা বা এরকম কিছু লেগে রয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মাঠে জড়ো হয়েছে শত শত মানুষ। প্রায় সবাই মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছে। নশুর নিম্নাঙ্গ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেছে। কেউ কেউ নতুন আসা দর্শককে বলছে, সুদি নশু কচি পোলা লইয়া মাদরাসায় ল্যাংটা ধরা খাইছে হাতেনাতে। আর নশু হতভম্ব

বোকার মতো সবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। পাশে যে যেভাবে পারছে, দুয়েকটা চড়-থাপ্পড় দিচ্ছে। আর মুখে বলছে, হারামজাদা পোলাখোর! কিন্তু এই আমজনতার মধ্যে নেই মাদরাসার কোনো শিক্ষক, নেই গফ্ফার পাটোয়ারী, নেই মোস্তাক। কেউ একজন একটা পাত্রে চুন আর কালি নিয়ে এসে তার মুখে ঘষেদিল। একজন এনে পরিয়ে দিল ছেঁড়া জুতার মালা। এগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কেউ প্রস্তাব করল, 'হালার ধনে ইট বান! পোলাখোর একটা!' যে যেখান থেকে পারছে, কিল-ঘুষি মারছে। কেউ এও বলল না যে আর মারিস না বা আস্তে মার। কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। এমনকি তার ভাতিজা বা স্ত্রীরাও কেউ না। মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে চাপা স্বরে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু নশু কিছুই বলছে না। শুধু সবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্য থেকে ছড়াল, সভাপতি এমন প্রায়ই মদ আর কচি পোলা নিয়ে মাদরাসায় সময় কাটাত। এ রকম ঘণ্টাখানেক চলার পর থানা থেকে ওসি এসে তাকে গ্রেপ্তার বা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেল। বিকেলের মধ্যে এলাকার সবার মোবাইলে নানা ব্যাপ্তির নানা অ্যাঙ্গেলের ভিডিও পাওয়া গেল। একটা ভিডিওতে পাওয়া গেল বিস্তারিত সবই। অর্থাৎ সুদি নশুর রুমে ঢোকা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছুই আছে। বোঝা যাচ্ছে, ক্যামেরাটা ঘরে আগে থেকেই সেট করা ছিল।

রাতে পুলিশ নওশাদ চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিল। বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো দশ হাজার পিস ইয়াবা, প্রচুর পরিমাণ দেশি ধারালো অস্ত্র, বেশ কয়েক বোতল দেশি-বিদেশি মদ, অসংখ্য জিহাদি বই, ছয়টি দেশি পিস্তল, আঙিনা থেকে তিনটি হরিণ, একটি ময়ূর। বেশ কয়েকটি কেস হলো তার নামে।

প্রচণ্ড প্রতাপশালী নওশাদ চৌধুরী ওরফে সুদি নশুর আকস্মিক পতনে পুরো এলাকায় থমথমে ভাব বিরাজ করছে। বাড়ি থেকে চলে গেছে তার দুই বিবি। বাড়ি একদম খাঁ খাঁ করছে। বাড়ি দখল করে নিয়েছে মোস্তাক। দুই দিন পর মোস্তাক তার চাচার নামে তার মা-বাবাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ এনে মামলা করল। একেবারে আকাশ থেকে পাতালে পতন হলো নওশাদ চৌধুরীর। শর্ত অনুযায়ী মোস্তাকের সভাপতি হওয়ার কথা থাকলেও সে সভাপতি হতে পারল না। কারণ, সভাপতির আচমকা পদস্খলন হলে কিংবা মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে কমিটির আইন অনুযায়ী এক নম্বর সহসভাপতির সভাপতি হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী মাদরাসার সভাপতি হলো একসময়ের ছিঁচকে চোর, স্মাগলার ও মাদক ব্যবসায়ী গফ্ফার পাটোয়ারী। মোস্তাককে বোঝানো হলো, খুব শীঘ্রই কমিটি ভেঙে দিয়ে তাকেই সভাপতি বানানো হবে। আপাতত তাকে মদ, ইয়াবা আর মেয়েমানুষ দিয়ে শান্ত করা গেল। তবে এ কথা সত্যি যে মোস্তাকের সহায়তা ছাড়া সুদি নশুর বিছানার নিচ থেকে দশ হাজার ইয়াবা পাওয়া যেত না, দেশি ধারালো অস্ত্র, অসংখ্য জিহাদি বই, ছয়টি দেশি পিস্তল–এসব কিছুই পাওয়া যেত না। মাদরাসা এখন পুরোপুরি মুহতামিম আর বদিউজ্জামান ওরফে মোহাম্মদ ওমর আলীর নিয়ন্ত্রণে।

এই প্রথম এই মাদরাসার কোনো শিশু ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত হলো। শিরোনাম 'শিশু বলাৎকাররত অবস্থায় মাদরাসা কমিটির সভাপতি হাতেনাতে ধৃত'।

যতই দিন যাচ্ছে, মাদরাসায় শিকল দেওয়া ছাত্রের পরিমাণ ততই বাড়ছে। টগরের পায়েও শিকল পড়েছে। আজ রাতে টগর প্রথম নতুন মুফতির খেদমতে যাবে। সে তার জীবন আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যা করার আল্লাহ্‌ই করবে। এখন তো আর পালানোর কোনো পথ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ আর মুখ তুলে চাইল না ছোট্ট টগরের দিকে। রাত তিনটার সময় দ্বিতীয়বার ধর্ষণ করার সময় পাইলসের প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে টগর প্রচণ্ড জোরে চিৎকার দিলে বদি তার মুখ চেপে ধরতে বাধ্য হয়। ধর্ষণ শেষে বদি টের পেল, টগর আর নড়াচড়া করছে না। বন্ধ হয়ে গেছে তার নিশ্বাস। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভয় পেয়ে গেল বদি। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। টেবিলে রাখা জগ থেকে পানি এনে চোখেমুখে ছিটা দিয়েও কোনো লাভ হলো না। কোনো সাড়া নেই। এখন? ওমর আলী দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা দিল মুহতামিমের ঘরের দরজায়। দরজা হালকা ফাঁকা করে মুহতামিম বলল, ‘কী হয়েছে বদি? কোনো সমস্যা?’ ‘আমার রুমে আসেন, ওস্তাদ।’ রুম থেকে বের হওয়ার সময় নিজের বিছানার দিকে একবার ফিরে তাকাল মুহতামিম। সেখানে ফ্যানের বাতাসে উড়ছে ফিনফিনে সাদা মশারি। তার মধ্যে শোয়া দশ-এগারো বছরের এক ফুটফুটে শিশু। তার গায়ে একটা সুতাও নেই।

মুহতামিম গিয়ে দেখল টগরের দেহে আর প্রাণ নেই। তার পায়ুপথ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তার মনে পড়ে গেল আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতে তাকে বাঁচিয়ে ছিল নওশাদ চৌধুরী। অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই বাঁচিয়েছিল। হ্যাঁ, বদিকেও সে বাঁচাবে। আর সেটাও নিজের প্রয়োজনে। সে বদিকে বলল, ‘যা হবার হইছে। এত দুশ্চিন্তার কিছু নাই। আমি আছি না। এই পোলা খালেস এতিম। বাপ মরছে ঠাডা পইড়া আর মা মরছে ডেঙ্গুতে। ওরে তোলো। চলো আমার সঙ্গে’। এত ছোট টগরের যে এত ওজন হবে, বুঝতে পারেনি বদি। চারদিক সুনসান নীরব। দুজন মিলে লাশ নিয়ে মসজিদে চলে গেল। তারপর মাথার পাগড়িকে ফাঁস বানিয়ে লাগাল টগরের গলায়। অন্য প্রান্ত ঝুলিয়ে দিল জানালার গ্রিলের সঙ্গে। তারপর ওমর আলীকে বলল,

– জিনের কারবার এইসব, বুচ্ছ?

– হ, এই মাদরাসায় তো প্রচুর বদজিন। এলাকার লোকজনও দেখলাম সে কথা জানে।

– ওর এক দূরসম্পর্কের ফুপু আছে। তারে কাইল খবর দিমু। মনে হয় না সে জিনের বিরুদ্ধে কেস করবে। সব ছাত্রের অভিভাবকেরা জানে এই বদ জিনের খবর।

মাদরাসার জিনের বাদশাহ বলে পরিচিত হাফেজ মাওলানা কবীর হোসেন। সে খবর শুধু এই এলাকা নয়, দুই-চার-দশ গ্রামের লোকও জানে। তারা অনেকেই কবীর মাওলানাকে দিয়ে জিন ছাড়িয়েছে। কবীর মাওলানার মায়ের চিকিৎসার জন্য কিছুদিন আগেও বদি সত্তর হাজার টাকা দিয়েছে। বলেছে লাগলে আরও দেবে। সকালবেলা গ্রিলে ঝুলন্ত টগরকে প্রথম দেখতে

পায় মুয়াজ্জিন। সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে সবাইকে ডাকল। ওমর আলী গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। কানে কানে বলল, 'জিনেই তো মারছে, তাইনা?' কবীর মাওলানা চোখমুখ শক্ত করে বলল, 'এ কাজ জিন ছাড়া আর কে করবে?' মসজিদ-মাদরাসা ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। মাদরাসায় আবার ছাত্র মারছে বদ জিনে। নিয়ম পালন করতে থানা থেকে পুলিশ এল। মুহতামিমকে বলল, 'আপনাদের মাদরাসায় জিনের উপদ্রব একটু বেশি। এখন কী করবেন?' 'হ, কী আর করার আছে? আপনারে তেল খরচ আর চা-পানির খরচ দিয়া দেই? কী বলেন? জিনের কাম, পোস্টমর্টেম কইরা কী আর করবেন?' পুলিশ লাশ নেবেকি নেবে না, তা নির্ভর করবে চা-পানির কেমন খরচ পাওয়া যায়, তার ওপর। মাদরাসা থেকে দুই কিলোমিটার পথের তেল খরচ দেওয়া হলো দুটি এক হাজার নোটের বান্ডেল। টগরের দূরসম্পর্কের ফুপুও সবকিছু শুনে বুঝতে পারল, এটা সত্যিই বদজিনের কাজ। তার চোখমুখ ভাবলেশহীন। সে মুহতামিম হুজুরকে বলল, 'ওরে আপনারা এখানেই দাফনের ব্যবস্থা করেন। আমার শ্বশুরবাড়ি তো অনেক দূর। মহিলা মানুষ, কেমনে কী করুম? ওর বাপ-মা কেউ নাই'। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো।

আরও মাস তিনেক পরের কথা। মুহতামিমকে ভালোভাবে সেবা শেষে মুতামিমের স্তন চাটতে চাটতে বদি বলল, আমারে কি সারা জীবন হাদিসখানার শিক্ষক বানাইয়া রাখবা, সোনা?

– কও, তুমি কী হইতে চাও?

– মুহতামিম, তোমার মতো মুহতামিম হইতে চাই। একটু ভড়কে গেল মুহতামিম।

শঙ্কা নিয়ে বলল, 'মানে? আমারে সরাইয়া দিয়া তুমি মুহতামিম হইবার চাও?'

– আরে বাল! আমি কি তাই কইছি? তুমি তো তোমার জায়গাতেই থাকবা। আমি হব নতুন মাদরাসার নতুন মুহতামিম!

– এইহানে তুমি নতুন মাদরাসা কই পাও?

– বানামু।

– মানে?

– ওহ্, তুমি একদমই কিছু বোঝো না। এলাকায় কোনো মহিলা মাদরাসার দরকার নাই? এইখানে একটা মহিলা মাদরাসা বানামু। জমি দিব মোস্তাক চৌধুরী, সভাপতিও হইব সে। আমার লগে তার বিস্তারিত আলাপ হইছে। কী, প্ল্যানডা কেমন?

– সেই রকম!

বলেই মুহতামিম বদির দুই রানের চিপা মোবারকে তার মুখ মোবারক রেখে আবার শুরু করল চকাস চকাস।

একসপ্তাহ পর জুমা নামাজের পর মিলাদ মাহফিল আর তবারক বিতরণ শেষে মহিলা মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। সেখানে উপস্থিত আছে নতুন মাদরাসার সভাপতি জনাব মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, আগের মাদরাসার সভাপতি কাম নতুন মাদরাসার সেক্রেটারি আলহাজ্ব আবদুল গফ্ফার পাটোয়ারী, নতুন মাদরাসার উপদেষ্টা কাম আগের মাদরাসার

মুহতামিম, মহিলা মাদরাসার মুহতামিম হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওমর আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য অনেকেই। পরের দিন সকাল থেকে কাজ শুরু হবে।
শুরু হলো আরেকটি উপাখ্যান, সমাজের গায়ে জেগে উঠল আরেকটি বিষফোঁড়া।

-০-

সমাপ্ত
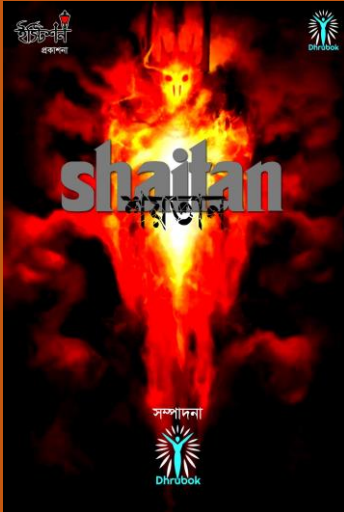
এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত কওমি মাদরাসায় শিশু ধর্ষণের ও শারীরিক নির্যাতনের সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে লিখিত একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের পঁচাশি শতাংশ ঘটনাই একেবারে সত্যি। শুধু স্থান-কাল-পাত্রের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

এটি কোনোভাবেই ইসলামবিরোধী কোনো উপন্যাস নয় এবং কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধেও নয়, বরং উপন্যাসটি ইসলাম ধর্মের বাংলাদেশে প্রচলিত এক কূপমণ্ডূকপশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরের জঞ্জাল নিয়ে, নানা অসংগতি নিয়ে, যা এখন বিষফোঁড়া হয়ে সমাজের গায়ে প্রতিনিয়ত জেগে উঠছে এবং একসময় তা ক্যানসারে পরিণত হয়ে এ দেশকে ধ্বংস করে ফেলবে।